হুমায়ুন আজাদ

লাল নীল দীপাবলি
বা
বাঙলা সাহিত্যের জীবনী

হাজার বছর আগে আমাদের প্রথম প্রধান কবি, কাহ্নপাদ, বলেছিলেন : নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। তাঁর মতো কবিতা লিখেছিলেন আরো অনেক কবি। তাঁদের নামগুলো আজ রহস্যের মতো লাগে : লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুআপা, ভুসুকুপা, শবরপার মতো সুদূর রহস্যময় ওই কবিদের নাম। তারপর কেটে গেছে হাজার বছর, দেখা দিয়েছেন অজস্র কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার। তাঁরা সবাই মিলে সৃষ্টি করেছেন আমাদের অসাধারণ বাঙলা সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্য চিরকাল একরকম থাকে নি, কালে কালে বদল ঘটেছে তার রূপের, তার হৃদয়ের। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন সৌন্দর্য। মধ্যযুগে কবিরা লিখেছেন পদাবলি, লিখেছেন মঙ্গলকাব্য। উনিশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠে অপরূপ অভিনব। তখন কবিতায় ভরপুর বাঙলা সাহিত্যে দেখা দেয় গদ্য, বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠে ব্যাপক ও বিশ্বসাহিত্য। বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যের শোভার কোনো শেষ নেই। বাঙলা সাহিত্যের অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর কবি হুমায়ুন আজাদ বাঙলা সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, যা শুধু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নয়, এটি নিজেই এক সাহিত্য সৃষ্টি। কবি হুমায়ুন আজাদ হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যকে তুলে ধরেছেন কবিতার মতো, জ্বেলে দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যের নানান রঙের দীপাবলি। এ-বই কিশোরকিশোরীদের তরুণতরুণীদের জন্যে লেখা, তারা সুখ পেয়ে আসছে এ-বই প'ড়ে, জানতে পারছে তাদের সাহিত্যের ইতিহাস; এবং এ-বই সুখ দিয়ে আসছে বড়োদেরও। লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী এমন বই, যার সঙ্গী হ'তে পারে ছোটোরা, বড়োরা, যারা ভালোবাসে বাঙলা সাহিত্যকে। বাঙলার প্রতিটি ঘরে আলো দিতে পারে এ-বই।

হুমায়ুন আজাদ

লাল নীল দীপাবলি
বা
বাঙলা সাহিত্যের
জীবনী

প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ : দ্বিতীয় মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৬ মার্চ ২০১০

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৮৩ : অক্টোবর ১৯৭৬
প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ আষাঢ় ১৪১৬ জুলাই ২০০৯

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : একশো টাকা

ISBN 978 984 04 1358 4

Lal Nil Dipabali ba Bangla Shahityer Jibani : Red and Blue lamps or A Biography of Bengali Literature :: Humayun Azad.
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
First Paperback Edition : Second Printing : March 2010

Price : Tk 100.00 only

উৎসর্গ

নাজমা বেগম : নাজুকে
সাজ্জাদ কবির : বাদলকে
মঞ্জুর কবির : মাতিনকে

পূর্বলেখ

যে-রকম বোধ আমাকে কবিতা লিখতে উৎসাহ দেয়, সে-রকম বোধে অনুপ্রাণিত হয়েই, দু-দশক আগে, লিখেছিলাম *লাল নীল দীপাবলি।* একটি দীর্ঘ কবিতার মতোই কয়েক দিনের মধ্যে লাল নীল দীপাবলি রচিত হয়ে উঠেছিলো। আজ আর আমার পক্ষে এ-বই লেখা সম্ভব নয়। এ-বইয়ের পাঠক হিশেবে আমার কল্পনায় ছিলো স্বপ্নকাতর সে-কিশোরকিশোরীরা তরুণতরুণীরা, যারা আছে কোমল কৈশোরের শেষ রেখায়, বা যারা কৈশোর পেরিয়ে ঢুকেছে এক বিস্ময়কর আলোতে, যাদের সৌরলোক ভ'রে গেছে সাহিত্যের স্বর্ণশস্যে। একদা আমি সবুজ বাল্যকাল পেরিয়ে সাহিত্যের মধ্যে মহাজগৎকে দেখেছিলাম, *লাল নীল দীপাবলি* তাদেরই জন্যে যারা আজ একদা আমার মতো। তবে তারা কি আজ আছে? শুনতে পাই সময় তাদেরও নষ্ট করেছে, তারা আর সাহিত্যের স্বর্ণশস্যে বুক ভরিয়ে তোলে না। অন্য নানা সোনায় তাদের বুক পরিপূর্ণ। বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকালে এক সময় আমার চোখে শুধু লাল নীল প্রদীপমালার রূপ ভেসে উঠতো, দেখতে পেতাম হাজার বছর ধ'রে জ্বেলে দেয়া ঝাড়লণ্ঠনের মালা। দীপ জ্বেলেছেন কাহ্নপাদ, দীপ জ্বেলেছেন বড়ু চণ্ডীদাস; হাজার বছর ধ'রে দীপ জ্বেলেছেন মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও আরো অনেকে। *লাল নীল দীপাবলিতে* আমি স্বপ্ননীল কিশোরকিশোরী তরুণতরুণীদের চোখের সামনে বাঙলা সাহিত্যের হাজার বছরকে আলোকমালার মতো জ্বেলে দিতে চেয়েছিলাম। কয়েক বছর আগে আরেকটি বই লিখেছি আমি : *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী।* এ-দুটি যুগল বই। আমি চাই এ-দুটি একসাথে থাকুক কিশোরকিশোরী তরুণতরুণীদের টেবিলে; একটি বলুক সাহিত্যের কথা, আরেকটি বলুক ভাষার কথা। *লাল নীল দীপাবলির* প্রথম প্রকাশের সময় বিদেশে ছিলাম, তাই রয়ে গিয়েছিলো মুদ্রণত্রুটি। সংশোধন করতে গিয়ে এবার বইটি নতুন ক'রে লিখেছি, কোনো কোনো পরিচ্ছেদ হয়েছে আগের থেকে অনেক বড়ো। *লাল নীল দীপাবলি* ১৯৭৩-এ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিলো 'দৈনিক বাংলা'র 'সাতভাই চম্পা'য়। এটিকে আমি *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনীর* যুগল বই ব'লে মনে করি ব'লে এবার এর নামে যোগ হলো *বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী।* আশা করি এবারও *লাল নীল দীপাবলি* পাবে কিশোরতরুণদের ভালোবাসা।

২৭ পৌষ ১৩৯৮ : ১১ জানুয়ারি ১৯৯২ — **হুমায়ুন আজাদ**
১৪ই ফুলার রোড : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা

সূচিপত্র

লাল নীল দীপাবলি

যদি তুমি চোখ মেলো বাঙলা সাহিত্যের দিকে, তাহলে দেখবে জ্বলছে হাজার হাজার প্রদীপ; লাল নীল সবুজ, আবার কালোও। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধ'রে রচিত হচ্ছে বাঙলা সাহিত্য। এর একেকটি বই একেকটি প্রদীপের মতো আলো দিচ্ছে আমাদের। বুক ভ'রে যায় সে-আলোকের ঝরনাধারায়; সে-আলোকে ভ'রে যায় টেবিল, খাতার ধূসর শাদা খসখসে পাতা, পৃথিবী ও স্বপ্নলোক। সাহিত্য হচ্ছে আলোর পৃথিবী, সেখানে যা আসে আলোকিত হয়ে আসে; কালো এসে এখানে নীল হয়ে যায়, অসুন্দর হয়ে যায় সুন্দর শিল্পকলা। বাঙলা সাহিত্যকে এমন সুন্দর ক'রে রচনা করেছেন যুগ যুগ ধ'রে কতো কবি, কতো গল্পকার। তাঁদের অনেকের নাম আমরা মনে রেখেছি, ভুলে গেছি অনেকের নাম। কিন্তু সকলের সাধনায় গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা সাহিত্য। সবাই সমান প্রতিভাবান নন, সময় সকলকে মনে রাখে না। সময় ভীষণ হিংসুটে, সে সব সময়ই ব'সে আছে একেকজন লেখকের নাম তার পাতা থেকে মুছে ফেলতে। এভাবে মুছে গেছে কতো কবির নাম; কতো লেখকের মুখের ছবি অকরুণ আঙুলে মুছে ফেলেছে সময়। কিন্তু এমন অনেকে আছেন সময় যাঁদের ভোলে না, বরং তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখে। যেমন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের নাম, বা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, আলাওলের নাম। এঁরা এতো বড়ো যে ভোলা যায় না, বরং তাঁদের নাম বার বার মনে পড়ে।

সময় থেমে থাকে না, সময়-নদী গোপনে বয়ে যায়। সাহিত্যও সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলে। এভাবেই সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, তার রূপান্তর সম্পন্ন হয়। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম বইটি হাতে নিলে চমকে উঠতে হয়, এটা যে বাঙলা ভাষায় লেখা সহজে বিশ্বাস হয় না। কেননা হাজার বছর আগে আমাদের ভাষাটিও অন্য রকম ছিলো, তা পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আজকের রূপ ধরেছে। এক হাজার বছর আগে সাহিত্যও আজকের মতো ছিলো না। আজ যে-সব বিষয়ে সাহিত্য রচিত হয়, তখন সে-সব বিষয় নিয়ে কোনো কবি লিখতেন না। সময় এগিয়ে গেছে, সাহিত্যের জগতে এসেছে নতুন নতুন ঋতু, এর ফলে বদলে গেছে তার রূপ। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম বইটির নাম হলো *চর্যাপদ।* এর কবিতাগুলো ছোটো ছোটো, কবিদের মনের কথা এগুলোতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর পরেই দেখা দেয় বড়ো বড়ো বই, বিরাট বিরাট তাঁদের গল্প, এবং কবিরাও মনের কথা বলছেন না, বলছেন মানুষ ও দেবতার গল্প। এর পরে আবার আসে ছোটো ছোটো কবিতা, এগুলোকে আমরা বলি বৈষ্ণব পদাবলি। এগুলোতে প্রবল আবেগ আর মনের কথা বড়ো হয়ে ওঠে। এভাবে সাহিত্য বদলায়। কবিরা চিরকাল একই বাঁশি বাজান না। প্রতিটি নতুন সময় তাঁদের হাতে তুলে দেয় নতুন বাঁশরী।

বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে আরো একটি কথা মনে রাখার মতো। এ-সাহিত্য জন্ম থেকেই বিদ্রোহী; এর ভেতরে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন। কেনো এ-আগুন? বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকের কাছে সহজে মর্যাদা পায় নি। এর জন্মকালে একে সহ্য করতে হয়েছে উঁচুশ্রেণীর অত্যাচার, উৎপীড়ন। দশম শতকে যখন বাঙলা সাহিত্য জন্ম নিচ্ছিলো, তখন সংস্কৃত ছিলো সমাজের উঁচুশ্রেণীর ভাষা, তারা সংস্কৃতের চর্চা করতো। ঠিক তখনি সংগোপনে সাধারণ লোকের মধ্যে জেগে উঠছিলো বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য। সাধারণ মানুষ একে লালনপালন করেছে বহুদিন। সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকেরা সব সময়ই হয় সুবিধাবাদী; যেখানে সুবিধা সেখানে তারা। তাই জন্মের সময় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য তাদের ভালোবাসা পায় নি, পেয়েছে অত্যাচার। তারপরে মুসলমান আমলে এ-উঁচুশ্রেণী সংস্কৃতের বদলে সেবা করেছে ফারসির, এবং ইংরেজ রাজত্বে তারা আঁকড়ে ধরেছে ইংরেজিকে। অথচ এরা ছিলো এদেশেরই লোক। তবে বাঙলা ভাষা বিদ্রোহী, অত্যাচারকে পরোয়া করে নি; নিজেকে প্রিয় করে তুলেছে সাধারণ মানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মতো জ্বলেছে। সাধারণ মানুষ একে নিজের রক্তের চেয়েও প্রিয় করে নিয়েছে, এবং একে ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এর ফলে ভীত হয়েছে উঁচুশ্রেণী, এবং সব কিছুকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য।

বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। *চর্যাপদ* হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বা গ্রন্থ। এটি রচিত হয়েছিলো দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে [৯৫০—১২০০ খ্রিস্টাব্দ]। এরপরে যুগে যুগে কবিরা, লেখকেরা এসেছেন; সৃষ্টি ক'রে গেছেন বাঙলা সাহিত্য। আমরা আজকাল সাহিত্যে দুটি ভাগ দেখে থাকি; এর একটি কবিতা, আর একটি গদ্য, যে-গদ্যে লেখা হয় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক আরো কতো কী। বাঙলা সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ কবিতা; ১৮০০ সালের আগে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য বিশেষ ছিলোই না। এতোদিন ধ'রে রচিত হয়েছে কেবল কবিতা। কবিতায় লেখা হয়েছে বড়ো বড়ো কাহিনী, যা আজ হ'লে অবশ্যই গদ্যে লেখা হতো। ভাবতে কেমন লাগে না যে সেকালে কেউ গদ্যে লেখার কথা ভাবলেন না, সব কিছু গেঁথে দিলেন ছন্দে! সব সাহিত্যেরই প্রথম পর্যায়ে এমন হয়েছে। এর কারণ মানুষ কবিতার যাদুতে বিহ্বল হ'তে ভালোবাসে। সেই ক্ষণে যে-দিন প্রথম সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিলো, সে-দিন লেখকের বুকে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিলো ছন্দ। তখন মানুষ সাহিত্যে খোঁজ করতো তা, যা বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় না। যে-ভাষায় তারা সারাদিন কথা বলতো, যে-গদ্যে ঝগড়া করতো, তাতে সাহিত্য হ'তে পারে একথা তারা ভাবতে পারে নি। তাই তারা বেছে নিয়েছিলো এমন জিনিশ, যা প্রতিদিনের ব্যবহারে মলিন নয়, যাতে ছন্দ আছে, সুর আছে। এমন হয়েছে সব দেশের সাহিত্যে; বাঙলা সাহিত্যেও। দশম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য রচিত হয়েছে কবিতায়, বা পদ্যে।

লাল নীল দীপাবলি বাঙলা সাহিত্যের প্রধান সংবাদগুলো শোনাবে। সব সংবাদ শুনবে বড়ো হ'লে। তখন তোমাদের হাতে আসবে *চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* বা বৈষ্ণব পদাবলি। হাতে পাবে বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের লেখা বড়ো বড়ো বইগুলো। রবীন্দ্রনাথ তখন তোমার হাতে হাতে ফিরবে; তোমার জন্যে কবিতা গল্প নাটক নিয়ে টেবিলে এসে হাজির হবেন কবি মধুসূদন দত্ত, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক শরৎ-বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর, কবি জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব, এবং আরো অনেকে। এবং আসবেন একালের লেখকেরা। তোমার চতুর্দিকে প্রদীপ, মাঝখানে তুমি ব'সে আছো। রাজা।

বাঙালি বাঙলা বাঙলাদেশ

একজন বাঙালি দেখতে কেমন? বাঙালিরা দেখতে ইংরেজের মতো ধবধবে শাদা নয়, নয় নিগ্রোর মতো মিশমিশে কালো। বাঙালিরা, অর্থাৎ আমরা, তুমি আমি এবং সবাই, আকারে হয়ে থাকি মাঝারি রকমের। আমাদের মাথার আকৃতি না-লম্বা না-গোল, আমাদের নাকগুলো তীক্ষ্ণও নয়, আবার ভোঁতাও নয়, এর মাঝামাঝি। উচ্চতায় আমাদের অধিকাংশই পাঁচ ফুটের ওপরে আর ছ-ফুটের নিচে। এ হচ্ছে বাঙালিদের সাধারণ রূপ। চারদিকে তাকালে এটা সহজে বোঝা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষ কারা; আমরা কাদের বিবর্তনের পরিণতি? আমরা একদিনে আজকের এ-ছোটোখাটো আকার, শ্যামল গায়ের রঙ লাভ করি নি। আমাদের পূর্বপুরুষ রয়েছে।

নৃতাত্ত্বিকেরা অনেক গবেষণা ক'রে সিদ্ধান্তে এসেছেন আমাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে সিংহলের ভেড্ডারা। এরা অনেক আগে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিলো। আমাদের শরীরের রক্তে তাদের রক্ত রয়েছে বেশি পরিমাণে। তবে আমরা অজস্র রক্তধারার মিশ্রণ : আমাদের শরীরে যুগেযুগে নানা জাতির রক্ত এসে ভালোবাসার মতো মিশে গেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন, ভারতবর্ষে শক হুন মোগল পাঠান সবাই লীন হয়ে আছে। ঠিক তেমনি বাঙালির শ্যামল শরীরে ঘুমিয়ে আছে অনেক রক্তস্রোত। আমরা ভেড্ডাদের উত্তরপুরুষ। আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি, ওরাঁও—এদের মধ্যেই শুধু নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে, এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও এদের উপাদান প্রচুর পাওয়া গেছে। ভেড্ডা রক্তধারার সাথে পরে মিলিত হয় আরো একটি রক্তধারা। এ-ধারাটি হলো মঙ্গোলীয়। মঙ্গোলীয়দের চোখের গঠন বড়ো বিচিত্র। তাদের চোখ বাদামি রঙের লাল আভামাখা, আর চোখের কোণে থাকে ভাঁজ। বাঙালিদের মধ্যে এরকম রূপ বহু দেখা যায়। এরপরে বাঙালির শরীরে মেশে আরো একটি রক্তধারা; এদের বলা হয় ইন্দো-আর্য। আর্যরা ছিলো সুদেহী, গায়ের রঙ গৌর, আকারে দীর্ঘ, আর তাদের নাক বেশ তীক্ষ্ণ। অনেক বাঙালির মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে।

এরপরে এদেশে আসে পারস্যের তুর্কিস্তান থেকে শকেরা। এরাও আমাদের রক্তে মিশে যায়। এভাবে নানা আকারের বিভিন্ন রঙের মানুষের মিলনের ফল আমরা। শকদের পরেও বাঙালির রক্তে মিশেছে আরো অনেক রক্ত। বিদেশ থেকে এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিজয়ীরা;—এদেশ শাসন করেছে, এখানে বিয়ে করেছে, বাঙালিদের মধ্যে মিশে গেছে। এসেছে মানুষ আরব থেকে, পারস্য থেকে, এসেছে আরো বহু দেশ থেকে। তারাও আমাদের মধ্যে আছে।

বাঙালি মুসলমানেরা কিন্তু প্রকৃতই বাঙালি। একালে বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ নিরর্থক গর্ব করতো যে তারা এদেশের নয়, তারা অমলিন মরুভূ আরবের। আমাদের মাঝে আরব রক্ত কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা এ-দেশেরই। আমরা আবহমানকাল ধ'রে বাঙালি। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পরে, অনেকটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে, এদেশের দরিদ্ররা, নিম্নবর্ণের লোকেরা, উৎপীড়িত বৌদ্ধরা মুসলমান হ'তে থাকে। কেননা মুসলমানরা সে-সময়ে এসেছে বিজয়ীর বেশে। অনেকে বিজয়ী শক্তির মোহে, অনেকে ধর্মের মোহে এবং অধিকাংশ দারিদ্র্য ও অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্যে মুসলমান হয়েছে।

এরা জাতিতে বাঙালি আর ধর্মে মুসলমান, যেমন আমরা। আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা বাঙালি।

তবে বহুদিন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কখনো ঠাণ্ডা, কখনো উত্তপ্ত লড়াই চলেছে নিজেদের জাতিত্ব নিয়ে। মুসলমানদের একদল, যারা কোনো রকমে অর্থ ও মর্যাদা লাভ করতে পেরেছিলো, তারা গর্ব করতে ভালোবাসতো এ ব'লে যে তারা এদেশের নয়, তারা আরবইরানের। এরা ছিলো অনেকটা গৃহহীনের মতো, বাস করতো এদেশে, খেতো এদেশের মাছভাত, কিন্তু স্বপ্ন দেখতো আরবইরানের। আরো একটি দল ছিলো, যারা অর্থ লাভ করতে পারে নি, সমাজের মাতব্বর হ'তে চায় নি, তারা নিজেদের দাবি ক'রে এসেছে বাঙলার বাঙালি ব'লে। এ-দু-দলের বিরোধ অনেক দিন ছিলো, ত্রয়োদশ শতক থেকে এই সেদিন পর্যন্ত এ-বিরোধে বাঙালি মুসলমানেরা সময় কাটিয়েছে। এজন্যে মধ্যযুগের এক মহৎ কবি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, যারা বাঙলায় জ'ন্মে বাঙলা ভাষাকে ঘৃণা করে তারা কেনো এদেশ ছেড়ে চলে যায় না? তারা চ'লে যাক। এ-কবির নাম আবদুল হাকিম। আমরা আজ এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছি, আমরা বাঙালি, বাঙলা আমাদের ভাষা, বাঙলাদেশ আমাদের দেশ।

বাঙলা ভাষা কোথা থেকে এলো? অন্য সকল কিছুর মতো ভাষাও 'জন্ম' নেয়, বিকশিত হয়, কালে কালে রূপ বদলায়। আজ যে-বাঙলা ভাষায় আমরা কথা বলি, কবিতা লিখি, গান গাই, অনেক আগে এ-ভাষা এরকম ছিলো না। বাঙলা ভাষার প্রথম বই *চর্যাপদ* আমরা অনেকে পড়তেও পারবো না, অর্থ তো একবিন্দুও বুঝবো না। কেননা হাজার বছর আগে যখন বাঙলা ভাষার জন্ম হচ্ছিলো, তখন তা ছিলো আধোগঠিত। তার ব্যবহৃত শব্দগুলো ছিলো অত্যন্ত পুরোনো, যার অনেক শব্দ আজ আর কেউ ব্যবহার করে না। সে-ভাষার বানানও আজকের মতো নয়। কিন্তু *চর্যাপদ*-এ যে-বাঙলা ভাষা সৃষ্টি হয় তাতো একদিনে হয় নি, হঠাৎ বাঙলা ভাষা সৃষ্টি হয়ে এসে কবিদের বলে নি, 'আমাকে দিয়ে কবিতা লেখো।' বাঙলা ভাষা আরো একটি পুরোনো ভাষার ক্রমবদলের ফল। ওই পুরোনো ভাষাটির নাম 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।' এ-প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা মানুষের মুখে মুখে বদলে পরিণত হয়েছে বাঙলা ভাষায়।

ভাষা বদলায় মানুষের কণ্ঠে। সব মানুষ এক রকম উচ্চারণ করে না, কঠিন শব্দ মানুষ সহজ ক'রে উচ্চারণ করতে চায়। এর ফলে পঞ্চাশ কি একশো বা তার চেয়েও বেশি সময় পরে দেখা যায়, ওই ভাষার অনেক শব্দের উচ্চারণ বদলে গেছে, বানান বদলে গেছে। দেখা যায় কোনো ভাষায় একশো বছর আগে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হতো, সেগুলোর আর ব্যবহার হচ্ছে না। তার বদলে মহাসমারোহে রাজত্ব বসিয়েছে নতুন নতুন শব্দ। এভাবে ভাষা বদলে যায়; এক ভাষার বুক থেকে জন্ম নেয় নতুন এক ভাষা, যার কথা বেশ আগে ভাবাও যেতো না। কিছু শব্দের বদল দেখা যাক। 'চন্দ্র' একটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি সুন্দর, মনোরম; কিন্তু উচ্চারণ করতে বেশ কষ্ট হয়। মানুষ ক্রমে এর উচ্চারণ করতে লাগলো 'চন্দ'। 'র' ফলা বাদ গেলো, উচ্চারণ সহজ হয়ে উঠলো। এরকম চললো অনেক বছর। পরে একদা নাসিক্যধ্বনি 'ন'-ও বাদ পড়লো, এবং 'চ'-এর গায়ে লাগলো আনুনাসিক আ-কার। এভাবে 'চন্দ্র' হয়ে উঠলো 'চাঁদ'। এভাবে 'কর্ণ' হয়ে গেলো 'কন্ন', এবং তার পরে হয়ে উঠলো 'কান'। আরো কিছু শব্দের বদল দেখা যাক :

শব্দটি প্রথমে ছিল	তারপর হয়	আর আজ
হস্ত	হথ, হাথ	হাত
বংশী	বংসী	বাঁশী, বাঁশি
বধূ	বহু	বউ
আলোক	আলোঅ	আলো
নৃত্য	ণচ্চ	নাচ

ভাষা এভাবে বদলে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা দিনে দিনে বদলে এক সময় হয়ে ওঠে বাঙলা ভাষা। ভাষা বদলের কিন্তু নিয়ম রয়েছে; খামখেয়ালে ভাষা বদলায় না। ভাষা মেনে চলে কতকগুলো নিয়মকানুন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা একদিন পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় 'পালি' নামক এক ভাষায়। পালি ভাষায় বৌদ্ধরা তাদের ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য নানা রকমের বই লিখেছে। পালি ভাষা ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়; তার উচ্চারণ আরো সহজ সরল রূপ নেয়, এবং জন্ম নেয় 'প্রাকৃত ভাষা'। এ-বদল একদিনে হয় নি, প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় লেগেছে এর জন্যে। প্রাকৃত ভাষা আবার বদলাতে থাকে, অনেক দিন ধ'রে বদলায়। তারপর দশম শতকের মাঝভাগে এসে এ-প্রাকৃত ভাষার আরো বদলানো একটি রূপ থেকে উদ্ভূত হয় একটি নতুন ভাষা, যার নাম বাঙলা। এ-ভাষা আমাদের।

কেউ কেউ মনে করেন, বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে সপ্তম শতাব্দীতে। কিন্তু আজকাল আর বাঙলা ভাষাকে এতো প্রাচীন ব'লে মনে করা হয় না; মনে করা হয় ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছিলো। প্রাচীন এ-বাঙলা ভাষার পরিচয় আছে *চর্যাপদ* নামক বইটির কবিতাগুলোতে। এর বাঙলা ভাষা প্রাচীন বাঙলা ভাষা, সদ্য জন্ম লাভ করেছে, তার আকৃতি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। এর ভাষা কেমন কেমন লাগে, এর শব্দগুলো আমাদের অপরিচিত, এর শব্দ ব্যবহারের রীতি আজকের রীতির থেকে ভিন্ন। এর কবিতাগুলো প'ড়ে অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়। আলো অন্ধকারের রহস্য এর ভাষার মধ্যে জড়িয়ে আছে। এজন্যে এর ভাষাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাভাষা'। সন্ধ্যার কুহেলিকা এর পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়ানো।

জন্মের পর থেকে বাঙলা ভাষা পাথরের মতো এক স্থানে ব'সে থাকে নি। বাঙলা ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, মানুষের কণ্ঠে, কবিদের রচনায়। এ-বদলের প্রকৃতি অনুসারে বাঙলা ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। প্রথম স্তরটি প্রাচীন বাঙলা ভাষা। এর প্রচলন ছিলো ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর দেড়শো বছর, ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত বাঙলা ভাষার কোনো নমুনা পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় স্তরটি মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা। ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে-ভাষা আমরা পাই, তাই মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা। এ-ভাষাও আজকের বাঙলা ভাষার মতো নয়। তবে তা হয়ে উঠেছে আমাদের আজকের ভাষার অনেক কাছাকাছি। এ-ভাষায় লেখা সাহিত্য অনায়াসে পড়া যায়, বোঝা যায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় আধুনিক বাঙলা ভাষা। আধুনিক বাঙলা ভাষাকেও ইচ্ছে করলে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

আজ যে-দেশের নাম বাঙলাদেশ, তার আকৃতি কিন্তু চিরকাল এরকম ছিলো না। আগে বাঙলাদেশ বিভক্ত ছিলো নানা খণ্ডে; তাদের নামও ছিলো নানারকম। কিন্তু 'বাঙলা' বা 'বঙ্গ' অথবা 'বাঙ্গালা' যে-নামেই একে ডাকি না কেনো, এর নামটি এসেছে কোথা

থেকে? এ-দেশের নামের কাহিনী বলেছেন সম্রাট আকবরের সভার এক রত্ন আবুল ফজল। তিনি বলেছেন 'বঙ্গ' শব্দের সাথে 'আল' শব্দটি মিলিত হয়ে এদেশের নাম হয়েছে 'বাঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা'। আমরা আজ বলি 'বাঙলা'। 'আল্' কাকে বলে ? এদেশে আছে খেতের পরে খেত; এক খেতের সাথে অপর খেত যাতে মিলে না যায়, তার জন্যে থাকে আল। 'আল' বলতে বাঁধও বোঝায়। এদেশ বৃষ্টির দেশ, বর্ষার দেশ, তাই এখানে দরকার হতো অসংখ্য বাঁধের। আল বা বাঁধ বেশি ছিলো ব'লেই এদেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাঙলা। বাঙলা নামের ব্যুৎপত্তিটি একটু কেমন কেমন। বাঙলাদেশ বহু বহু বছর আগে বিভক্ত ছিলো নানা জনপদ বা অংশে। একেকটি কোমের নরনারী নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিলো একেকটি জনপদ। ওই জনপদের নাম হতো যে-কোম সেখানে বাস করতো, তার নামে। কয়েকটি কোমের নাম : বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। এ-কোমগুলো যে-জনপদগুলোতে বাস করতো পরে সে-জনপদগুলোর নাম হয় বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ও রাঢ়। এগুলো ছিলো পৃথক রাষ্ট্র।

প্রাচীনতম কাল থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাদেশ ছিলো এসব ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভক্ত। একটি রাষ্ট্রে জমাট বাঁধতে এর অনেক সময় লেগেছে। সপ্তম শতাব্দীর আদিভাগে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হন। তাঁর সময়ে বর্তমানের পশ্চিম বাঙলা প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর বাঙলাদেশে তিনটি জনপদ বড়ো হয়ে দেখা দেয়, অন্যান্য জনপদ সেগুলোর কাছে ম্লান হয়ে যায়। এ-জনপদ তিনটি হচ্ছে পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়। শশাঙ্ক ও পালরাজারা অধিপতি ছিলেন রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের। কিন্তু তাঁদের সময়ে একটি মজার কাণ্ড ঘটে। তাঁরা নিজেদের 'রাঢ়াধিপতি' ব'লে পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন 'গৌড়াধিপতি' ব'লে। গৌড় নামে সমগ্র দেশকে সংহত করতে চেয়েছিলেন শশাঙ্ক, পালরাজারা, এবং সেনরাজারা। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সার্থক হয় নি। কেননা গৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো বঙ্গ। পাঠান শাসনকালে জয় হয় বঙ্গের; পাঠান শাসকেরা বঙ্গ নামে একত্র করেন বাঙলার সমস্ত জনপদ। ইংরেজদের শাসনকালে বাঙলা নামটি আরো প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু আকারে হয়ে পড়ে ছোটো।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ত্রিখণ্ডিত হয়। বাঙলার একটি বড়ো অংশ হয়ে পড়ে পাকিস্তানের উপনিবেশ। তখন তার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু বাঙালিরা বাঙলার এ-নাম মনেপ্রাণে কখনো গ্রহণ করে নি। তাই ১৯৭১-এ জন্ম নেয় নতুন বাঙলাদেশ। বাঙলা সাহিত্য বাঙলাদেশ, এবং বর্তমানে যাকে 'পশ্চিম বাঙলা' বলা হয়, তার মিলিত সম্পদ।

বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রচিত হচ্ছে বাঙলা সাহিত্য। তাই বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। এ-সময়ে সৃষ্টি হয়েছে সুবিশাল এক সাহিত্য। সাহিত্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করে। কালে কালে নতুন হয়ে সামনের দিকে এগোয় সাহিত্য। হাজার বছরে বাঙলা সাহিত্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিয়েছে, এ-বাঁকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যকে ভাগ করা হয় তিনটি যুগে। যুগ তিনটি হচ্ছে :

[ক] প্রাচীন যুগ : ৯৫০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত।
[খ] মধ্যযুগ : ১৩৫০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।
[গ] আধুনিক যুগ : ১৮০০ থেকে আজ পর্যন্ত, আরো বহুদিন পর্যন্ত।

এ-তিন যুগের সাহিত্যই বাঙলা সাহিত্য, কিন্তু তবু বিষয়বস্তুতে, রচনারীতিতে এ-তিন যুগের সাহিত্য তিন রকম। প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় একটি মাত্র বই, যার নাম *চর্যাপদ।* এর ভাষা আজ দুর্বোধ্য, বিষয়বস্তু দুরূহ। এর কবিরা সকলের জন্যে সাহিত্য রচনা করেন নি, করেছেন নিজেদের জন্যে। তাছাড়া সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁদের ছিলো না। তাঁরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ সাধক; তাঁরা এ-কবিতাগুলোতে নিজেদের সাধনার গোপন কথা বলেছেন। তবু মনের ছোঁয়ায় তাতে লেগেছে সাহিত্যের নানা রঙ ও সৌরভ। এর পরে দেড়শো বছর বাঙলা ভাষায় আর কিছু রচিত হয় নি। কালো, ফসলশূন্য এ-সময়টিকে [১২০০ থেকে ১৩৫০] বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। কেননা এ-সময়ে আমরা কোনো সাহিত্য পাই নি। অন্ধকার যুগের পরে পুনরায় প্রদীপ জ্বলে, আসে মধ্যযুগ। এ-যুগটি সুদীর্ঘ। এ-সময়ে রচিত হয় অসংখ্য কাহিনীকাব্য, সংখ্যাহীন গীতিকবিতা; মানুষ আর দেবতার কথা গীত হয় একসাথে। আগের মতো সাহিত্য আর সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি, এর মধ্যে দেখা দেয় বিস্তার। এর ফলে সাহিত্যে স্থান পায় দেবতা ও দৈত্য, মানুষ ও অতিমানুষ; আসে গৃহের কথা, সিংহাসনের কাহিনী। এ-সময়ে যাঁরা মহৎ কবি, তাঁদের কিছু নাম : বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, আলাওল, কাজী দৌলত। মধ্যযুগের এক শ্রেণীর কাব্যকে বলা হয় 'মঙ্গলকাব্য'। এগুলো বেশ দীর্ঘ কাব্য। কোনো দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠার কাহিনী এগুলোতে বলেন কবিরা। এজন্যে মঙ্গলকাব্য দেবতাদের কাব্য। মধ্যযুগের সকল সাহিত্যই দেবতাকেন্দ্রিক, মানুষ সে-সময়ে প্রাধান্য লাভ করে নি। মানুষের সুখদুঃখের কথা এসেছে দেবতার কথাপ্রসঙ্গে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা দেবতার ছদ্মবেশে এ-সব কাব্য জুড়ে আছে মানুষ।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি। এ-কবিতাগুলো ক্ষুদ্র; কিন্তু এগুলোতে যে-আবেগ প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলনাহীন। এ-কবিতার নায়কনায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা। বৈষ্ণব কবিরা কখনো রাধার বেশে কখনো কৃষ্ণের বেশে নিজেদের হৃদয়ের আকুল আবেগ প্রকাশ করেছেন এ-কবিতাগুলোতে। মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা একটি নতুন প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথম শোনান নিছক মানুষের গল্প। মধ্যযুগে হিন্দু কবিরা দেবতার গান ও কাহিনী রচনায় যখন সমর্পিত, তখন মুসলমান কবিরা ইউসুফ-জুলেখা বা লাইলি-মজনুর হৃদয়ের কথা শোনান। এর ফলে দেবতার বদলে প্রাধান্য লাভ করে মানুষ। এ-মানুষ যদিও কল্পনার সৃষ্টি, তবু মানুষের কথা সবার আগে বলার কৃতিত্ব মুসলমান কবিরা দাবি করতে পারেন।

মধ্যযুগের অবসানে আসে আধুনিক যুগ, এইতো সেদিন, ১৮০০ অব্দে। আধুনিক যুগের সব চেয়ে বড়ো অবদান গদ্য। প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য বলতে বিশেষ কিছু ছিলো না। তখন ছিলো কেবল কবিতা বা পদ্য। তখন গদ্য ছিলো না, তা নয়; গদ্যসাহিত্য ছিলো না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা সুপরিকল্পিতভাবে বিকাশ ঘটান বাঙলা গদ্যের। তাঁদের প্রধান ছিলেন উইলিয়ম কেরি। কেরির সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। উনিশশতকের প্রথম অর্ধেক কেটেছে সদ্য জন্মনেয়া গদ্যের লালনপালনে।

বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভঙ্গিতে গদ্য রচনা করেছেন, আর বিকশিত হয়েছে বাঙলা গদ্য। সে-সময়ের যাঁরা প্রধান গদ্যলেখক, তাঁরা হচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত। গদ্যের সাথে সাহিত্যে আসে বৈচিত্র্য; উপন্যাস দেখা দেয়, রচিত হয় গল্প নাটক প্রহসন প্রবন্ধ আরো কতো কী। প্রথম উপন্যাস লেখেন প্যারীচাঁদ মিত্র; উপন্যাসের নাম *আলালের ঘরের দুলাল।* মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাম *মেঘনাদবধকাব্য।* মধুসূদন দত্ত আধুনিক কালের একজন মহান প্রতিভা। তাঁর হাতে সর্বপ্রথম আমরা পাই মহাকাব্য ও সনেট, পাই ট্রাজেডি, নাম *কৃষ্ণকুমারীনাটক।* পাই প্রহসন, নাম *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা।* এরপরে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ। তারপর আসেন মোহিতলাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরো কতো প্রতিভা। তাঁরা সবাই বাঙলা সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ

বাঙলা ভাষার প্রথম বইটির নাম বেশ সুন্দর রহস্যময়। বইটির নাম *চর্যাপদ।* বইটির আরো কতকগুলো নাম আছে। কেউ বলেন এর নাম *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়,* আবার কেউ বলেন এর নাম *চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়।* বড়ো বিদঘুটে খটমটে এ-নামগুলো। তাই এটিকে আজকাল যে-মনোরম নাম ধ'রে ডাকা হয়, তা হচ্ছে *চর্যাপদ*। বেশ সহজ সুন্দর এ-নাম। বইটির কথা বিশশতকের গোড়ার দিকেও কেউ জানতো না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই বছর যান নেপালে। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার ক'রে তিনি নিয়ে আসেন কয়েকটি অপরিচিত বই। এ-বইগুলোর একটি হচ্ছে *চর্যাপদ। চর্যাপদ-এর* সাথে আরো দুটি বই—*ডাকার্ণব* ও *দোহাকোষ,* যেগুলোকে তিনি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে *চর্যাপদ*—এর সাথেই আবিষ্কার করেছিলেন— মিলিয়ে একসাথে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা* (১৩২৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ-বই বেরোনোর সাথে সাথে সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়, সবাই বাঙলা ভাষার আদি নমুনা দেখে বিস্মিত চকিত বিহ্বল হয়ে পড়ে। শুরু হয় একে নিয়ে আলোচনা আর আলোচনা। বাঙালি পণ্ডিতেরা *চর্যাপদকে* দাবি করেন বাঙলা ব'লে। কিন্তু এগিয়ে আসেন অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতেরা। অসমীয়া পণ্ডিতেরা দাবি করেন একে অসমীয়া ভাষা ব'লে, ওড়িয়া পণ্ডিতেরা দাবি করেন একে ওড়িয়া ব'লে। মৈথিলিরা দাবি করেন একে মৈথিলি ভাষার আদিরূপ ব'লে, হিন্দিভাষীরা দাবি করেন হিন্দি ভাষার আদিরূপ ব'লে। একে নিয়ে সুন্দর কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়।

এগিয়ে আসেন বাঙলার সেরা পণ্ডিতেরা। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে একটি ভয়াবহ বিশাল বই লিখেন *বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ* (১৯২৬) নামে, এবং প্রমাণ করেন *চর্যাপদ* আর কারো নয়, বাঙালির। *চর্যাপদ*-এর ভাষা বাঙলা। আসেন ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁরা ভাষা, বিষয়বস্তু, প্রভৃতি আলোচনা ক'রে প্রমাণ করেন *চর্যাপদ* বাঙলা ভাষায় রচিত; এটি আমাদের প্রথম বই। *চর্যাপদ* জ্ব'লে ওঠে বাঙলা ভাষার প্রথম প্রদীপের মতো, আলো দিতে থাকে আমাদের দিকে, আর আমরা সে-আলোতে পথ দেখে দেখে হাজার বছরের পথ হেঁটে আসি। সত্যিই আজ বিশশতকের শেষাংশে দাঁড়িয়ে এ-বইয়ের দিকে তাকালে একে প্রদীপ না ব'লে থাকা যায় না। এ-প্রদীপের শিখা অনির্বাণ। জ্বলে চিরকালের উদ্দেশে।

চর্যাপদ কতকগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। এতে আছে ৪৬টি পূর্ণ কবিতা, এবং একটি ছেঁড়া খণ্ডিত কবিতা। তাই এতে কবিতা রয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি। এ-কবিতাগুলো লিখেছিলেন ২৪জন বৌদ্ধ বাউল কবি, যাঁদের ঘর ছিলো না, বাড়ি ছিলো না; যাঁরা ঘর চান নি, বাড়ি চান নি। সমাজের নিচুতলার অধিবাসী ছিলেন আমাদের ভাষার প্রথম কবিকুল। তাঁদের নামগুলোও কেমন কেমন; নাম যে এমন হ'তে পারে, তা তাঁদের নামগুলো শোনার আগে ভাবতেও পারা যায় না। কিছু নাম : কাহ্নপাদ, লুইপাদ, সরহপাদ, চাটিল্লপাদ, ডোম্বিপাদ, ঢেণ্টপাদন, শবরপাদ। সবার নামের শেষে আছে 'পাদ' শব্দটি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন কাহ্নপাদ। কাহ্নপাদের অন্য নাম কৃষ্ণাচার্য। তাঁর লেখা কবিতা পাওয়া গেছে বারোটি। ভুসুকুপাদ লিখেছেন ছটি কবিতা, সরহপাদ লিখেছেন চারটি, কুক্কুরিপাদ তিনটি; লুইপাদ, শান্তিপাদ, শবরপাদ লিখেছেন দুটি ক'রে কবিতা, বাকি সবাই লিখেছেন একটি ক'রে কবিতা।

এ-কবিতাগুলো সহজে প'ড়ে বোঝা যায় না; এর ভাষা বুঝতে কষ্ট হয়, ভাব বুঝতে হিমশিম খেতে হয়। কবিরা আসলে কবিতার জন্যে কবিতা রচনা করেন নি; এজন্যেই এতো অসুবিধা; পদে পদে পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। আমাদের প্রথম কবিরা ছিলেন গৃহহীন বৌদ্ধ বাউল সাধক। তাঁদের সংসার ছিলো না। তাঁরা সাধনা করতেন গোপন তত্ত্বের। সে-তত্ত্বগুলো তাঁরা কবিতায় গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে একমাত্র সাধক ছাড়া আর কেউ তাঁদের কথা বুঝতে না পারে। তাই যখন প্রাচীন ভাষাটি বেশ রপ্ত ক'রে পড়তে যাই *চর্যাপদ*, দেখি এর কথাবার্তাগুলো কেমন হেঁয়ালির মতো। একবার মনে হয় বুঝতে পারছি, পরমুহূর্তে মনে হয় কিছু বুঝছি না। *চর্যাপদ* পড়ার মানে হলো চমৎকার ধাঁধার ভেতরে প্রবেশ করা।

কিন্তু এ-কবিতাগুলোতে শুধু ধর্মের কথাই নেই, আছে ভালো কবিতার স্বাদ। আছে সেকালের বাঙলার সমাজের ছবি, আর ছবিগুলো এতো জীবন্ত যে মনে হয় এইমাত্র প্রাচীন বাঙলার গাছপালা, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু হেঁটে এলাম। আছে গরিব মানুষের বেদনার কথা, রয়েছে সুখের উল্লাস। বর যাচ্ছে বিয়ে করতে তার ছবি আছে, গম্ভীরভাবে গভীর নদী বয়ে যাচ্ছে তার চিত্র রয়েছে, ফুল ফুটে আকাশ ঢেকে ফেলেছে তার দৃশ্য আছে, পাশা খেলছে লোকেরা তার বর্ণনা আছে। একটি কবিতায় এক দুঃখী কবি তাঁর সংসারের অভাবের ছবি এতো মর্মস্পর্শী ক'রে এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হয়। কবির ভাষা তুলে দিচ্ছি :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায়॥

কবি বলেছেন, টিলার ওপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। বেঙের মতো প্রতিদিন সংসার আমার বেড়ে চলছে, যে-দুধ দোহানো হয়েছে তা আবার ফিরে যাচ্ছে গাভীর বাঁটে। বেশ করুণ দুঃখের ছবি এটি। কবি যে খুব দরিদ্র শুধু তাই নয়, তাঁর ভাগ্যটি বেশ খারাপ। তাই বলেছেন, দোহানো দুধ ফিরে যাচ্ছে আবার গাভীর বাঁটে। এরকম বেদনার কথা অনেক আছে *চর্যাপদ*-এ, আছে সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকের অত্যাচারের ছবি। তাই কবিরা সুযোগ পেলেই উপহাস করেছেন ওই সব লোকদের। আজকাল শ্রেণীসংগ্রামের কথা বেশ বলা হয়; শ্রেণীসংগ্রামের জন্যে রচিত হয় সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো প্রথম কবিতাগুচ্ছেই।

এ-কবিতাগুলোতে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর উপমা; আছে মনোহর কথা, যা সত্যিকার কবি না হ'লে কেউ বলতে পারে না। একজন কবি একটি জিনিশ সম্বন্ধে বলেছেন, সে-জিনিশটি জলে যেমন চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার মতো সত্যও নয়, আবার মিথ্যেও নয়। এ-রকম চমৎকার কথা অনেক পরে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ মেয়ে' নামক একটি বিখ্যাত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবু কি সত্য নয়?' সোনায় বানানো হীরেবসানো ফুল তো আর সত্যিকার ফুল নয়, ওটা হচ্ছে বানানো মিছে ফুল। ও ফুল বাগানে ফোটে না, তবু আমরা তাকে ফুল বলি। আরো একজন কবি, যাঁর নাম কম্বলাম্বরপাদ, তাঁর ধনসম্পদের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন :

সোণে ভরিতী করুণা নাবী।
রুপা থুই নাহিক ঠাবী।

কবি বলেছেন, আমার করুণা নামের নৌকো সোনায় সোনায় ভ'রে গেছে। সেখানে আর রুপো রাখার মতো তিল পরিমাণে জায়গা নেই। একথা পড়ার সাথে সাথে মনে প'ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনার তরী'র সেই পংক্তিগুলো, যেখানে কবি বলেছেন, 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এক কবি বলছেন, হরিণের মাংসের জন্যে হরিণ সকলের শত্রু; আরেকজন বলছেন, শরীরটি হচ্ছে একটি বৃক্ষ, পাঁচটি তার ডাল। সবচেয়ে ভালো কবিতাটি লিখেছেন কবি শবরীপাদ। তিনি আনন্দের যে-ছবি এঁকেছেন তা তুলনাহীন। কবি হৃদয়ের সুখে বিভোর হয়ে আছেন, যেমন মানুষ থাকে স্বপ্নে। তাঁর কিছু পংক্তি তুলে দিচ্ছি :

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ॥

এর কথাগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি মনমাতানো এর ছন্দ। কবি নিজের রূপসী স্ত্রী নিয়ে মহাসুখে আছেন। বলছেন, উঁচু উঁচু যেখানে পাহাড় সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। তার পরিধানে ময়ূরের বহুবর্ণ পুচ্ছ, গলায় আছে গুঞ্জাফুলের মালা। তারপর কবি নিজের উদ্দেশে বলছেন, হে অস্থির পাগল শবর, তুমি গোল বাঁধিও না, এ তোমার স্ত্রী, এর নাম সহজসুন্দরী। শেষ যে-পংক্তিটি তুলে এনেছি তাতো আনন্দের এবং প্রকৃতি বর্ণনার অনিন্দ্য উদাহরণ। বলছেন, অসংখ্য গাছে মুকুল ধরেছে, আর আকাশে ছুঁয়ে গেছে তাদের ডাল। এ-বর্ণনা পড়ার সময় চোখের মধ্যে গাছের ফুল মুকুল আর শাখাপুঞ্জ ন'ড়ে ওঠে। আমরা আবেগে কবি হয়ে উঠি। *চর্যাপদ-এর* সবগুলো কবিতা ছন্দে রচিত, পংক্তির শেষে আছে মিল। এগুলো আসলে গান, তাই কবিরা প্রতিটি কবিতার শুরুতে কোন সুরে কবিতাটি গাওয়া হবে, তার উল্লেখ করেছেন। এমন কয়েকটি সুর বা রাগের নাম : রাগ পটমঞ্জরী, রাগ অরু, রাগ ভৈরবী। বাঙলা কবিতায় ১৮০০ সালের আগে যা কিছু রচিত হয়েছে, সবই রচিত হয়েছে গাওয়ার উদ্দেশ্যে। আজকাল আমরা কবিতা পড়ি, গাই না। আগে কবিরা কবিতা গাইতেন, পাঠকেরা শুনতো কবির চারদিকে ব'সে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে-দিন কবিতা লিখলেন সে-দিন থেকে কবিতা হয়ে উঠলো পড়ার বস্তু, গাওয়ার নয়। *চর্যাপদ-এর* কবিতাগুলো গাওয়া হতো। তাই এগুলো একই সাথে গান ও কবিতা। বাঙালির প্রথম গৌরব এগুলো।

অন্ধকারে দেড়শো বছর

চর্যাপদ রচিত হয়েছিলো ৯৫০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে। কিন্তু এরপরেই বাঙলা সাহিত্যের পৃথিবীতে নেমে আসে এক করুণ অন্ধকার, আর সে-আঁধার প্রায় দেড়শো বছর টিকেছিলো। ১২০০ অব্দ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লেখা কোনো সাহিত্য আমাদের নেই। কেনো নেই? এ-সময়ে কি কিছুই লেখা হয় নি? কবিরা কোথায় গিয়েছিলেন এ-সময়? কোনো একটি ভাষায় দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ কিছু লিখলো না, একি সম্ভব হ'তে পারে? কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে এ-সময়ে কিছু লেখা হয় নি। ১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না ব'লে এ-সময়টাকে বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। পণ্ডিতেরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি। এ-সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোনো আলো আসে না, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।

১২০০ থেকে ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত ক'রে বাঙলায় আসে মুসলমানেরা। অনেকে মনে করেন মুসলমানেরা এতো অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়েছিলো যে কারো মনে সাহিত্যের কথা জাগে নি। তাই এ-সময়ে বাঙলা ভাষা সাহিত্যহীন মরুভূমি। কিন্তু এ-যুক্তি মানা যায় না। কেননা দেড়শো বছর ধ'রে রক্তপাত চলতে পারে না। তাহলে মানুষ রইলো কী ক'রে? মুসলমানেরা তো বাঙালিদের মারার জন্যেই আসে নি, তারা

এসেছিলো রাজত্ব করতে। এছাড়া পরবর্তীকালে দেখা গেছে মুসলমান রাজারা বাঙলা সাহিত্যকে বেশ উৎসাহ দিচ্ছে। যারা পরে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিলো, তারাই আগে সাহিত্যকে দমিয়ে দিয়েছিলো এরকম হ'তে পারে না। বাঙলা সাহিত্যকে ধ্বংস করার জন্যে তো আর তারা আসে নি। তাহলে সাহিত্য হলো না কেনো, কেনো আমরা পাই না একটিও কবিতা, একটিও কাহিনীকাব্য? আগে সাহিত্য লিখিত হতো না, মুখে মুখে গাওয়া হতো। তখন ছাপাখানা ছিলো না, পুথি লিখিয়ে নেয়ায় ছিলো অনেক অসুবিধা। তাই কবিরা মুখে মুখে রচনা করতেন তাঁদের কবিতা, কখনো তা হয়তো হতো ছোটো আয়তনের, কখনো বা হতো বিরাট আকারের। রচনা ক'রে তা স্মরণে রেখে দিতেন, নানা জায়গায় গাইতেন। কবিতা যারা ভালোবাসতো তারাও মুখস্থ ক'রে রাখতো কবিতা। এভাবে কবিতা বেঁচে থাকতো মানুষের স্মৃতিতে, কণ্ঠে। আজকের মতো ছাপাখানার সাহায্য সেকালের কবিরা লাভ করেন নি। তাই যে-কবিতা একদিন মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যেতো, সে-কবিতা হারিয়ে যেতো চিরকালের জন্যে।

তাহলে *চর্যাপদকে* লেখা অবস্থায় পাওয়া গেলো কেমনে? এ-বইটি কিন্তু বাঙলায় পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে নেপালে। নেপালের ভাষা বাঙলা নয়। বাঙলা ভাষাকে ধ'রে রাখার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিলো একে বর্ণমালায় লিখে রাখার। তাই অন্ধকার সময়ের রচনার সম্বন্ধে আমরা অনুমান করতে পারি যে এ-সময়ে যা রচিত হয়েছিলো, তা কেউ লিখে রাখে নি, তাই এতোদিনে তা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। তবু বিস্ময় থেকে যায়, কারণ দেড়শো বছর ধ'রে কোনোও কবিতা লিপিবদ্ধ হলো না, এ কেমন? এর পরে তো আমরা বাঙলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাচ্ছি, আমাদের সামনে আসছে একটির পরে একটি মঙ্গলকাব্য, আসছে পদাবলির ধারা। ১৩৫০ সালের পরেই আসেন মহৎ মহৎ কবিরা; আসেন বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য নিয়ে, এবং আসর মাতিয়ে তুলেছেন আরো কতো কবি। 'অন্ধকার যুগ' আমাদের কাছে এক বিস্ময়। এ-সময়টা বাঙলা সাহিত্যের কৃষ্ণগহ্বর।

এ-বিস্ময় আর অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কেউ কেউ অন্য রকম কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, *চর্যাপদকে* যদি আমরা বাঙলা না বলি, তাহলে অন্ধকার যুগ ব'লে কিছু থাকে না, বাঙলা সাহিত্য শুরু হয় চতুর্দশ শতক থেকে। কিন্তু *চর্যাপদ* যে বাঙলা, তা কী ক'রে ভুলে যাই! *চর্যাপদ*-এ বাঙলা ভাষার জন্মের পরিচয় পাই, মধ্যযুগের রচনায় পাই বাঙলা ভাষার বিকাশের পরিচয়। মাঝখানে থেকে যায় একটি অন্ধকারের পর্দা, জমাট অন্ধকার, যার আবির্ভাবের কোনো ঠিক কারণ কেউ দেখাতে পারবেন না।

প্রদীপ জ্বললো আবার : মঙ্গলকাব্য

এক সময় অন্ধকার যুগের অবসান হয়, আবার জ্বলে দীপশিখা বাঙলা সাহিত্যের আঙ্গিনায়। এবার যে-দীপ জ্ব'লে *ওঠে*, তা আর কোনো দিন নেভে নি, সে-শিখা ধারাবাহিক অবিরাম জ্ব'লে যেতে থাকে। অন্ধকার যুগের অবসানে নতুন নতুন সাহিত্য রচিত হ'তে থাকে বাঙলা

ভাষায়; অসংখ্য কবি এসে হাজির হন বাঙলা সাহিত্যের সভায়। তাঁদের কণ্ঠে শুধু গান আর গান। কবিদের বীণা বেজে ওঠে নানা সুরে। শুরু হয় বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগ; চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে। এ-মধ্যযুগের শুরুতেই রচিত হয় একটি দীর্ঘ অসাধারণ কাব্য, যার নাম *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।* এ-কাব্যটি যিনি রচনা করেন, তাঁর নাম বড়ু চণ্ডীদাস। এ-কাব্যটির সংবাদও আমাদের অনেক দিন জানা ছিলো না। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করেন শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। কাব্যটির নায়কনায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কবি বড়ু চণ্ডীদাস বাঙলা ভাষার প্রথম মহাকবি। তিনি আমাদের প্রথম রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু মধ্যযুগ যে-কাব্যগুলোর জন্যে বিখ্যাত, সেগুলোকে বলা হয় 'মঙ্গলকাব্য'। মধ্যযুগের শুরু থেকে অসংখ্য কবি রচনা করতে থাকেন মঙ্গলকাব্য, আর এ-রচনা শেষ হয় মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে এসে। মঙ্গলকাব্য হচ্ছে মধ্যযুগের উপন্যাস; এ-কাব্যগুলোতে কবিরা অনেক বড়ো বড়ো কাহিনী বলেছেন। তবে এ-কাহিনী আমাদের মতো মানুষের কাহিনী নয়, এগুলো দেবতাদের কাহিনী। দেবতারা জুড়ে থাকে এ-কাব্যগুলোর অধিকাংশ, মানুষ আসে গৌণ হয়ে। এ-কাব্যগুলোকে কেনো বলা হয় মঙ্গলকাব্য? কেউ বলেন, দেবতাদের কাছে মঙ্গল কামনা ক'রে এ-কাব্যগুলো রচিত হয়েছে ব'লে এগুলোর নাম মঙ্গলকাব্য। আবার কেউ বলেন, এ-কাব্যগুলো গাওয়া হতো এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত, তাই এগুলোর পরিচয় মঙ্গলকাব্য ব'লে। আবার অনেকে বলেন, এগুলো গাওয়া হতো যে-সুরে, সে-সুরের নাম মঙ্গল; তাই এগুলোর নাম মঙ্গলকাব্য। এগুলোকে আমরা কাহিনীকাব্য বলতে পারি।

প্রায় পাঁচশো বছর ধ'রে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। নানা শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রয়েছে বাঙলা সাহিত্যে। এ-কাব্যগুলোর রয়েছে অনেকগুলো সাধারণ রূপ। যেমন : প্রতিটি কাব্যেই দেখা যায় স্বর্গের কোনো এক দেবতা নিজের কোনো অপরাধের জন্যে শাপগ্রস্ত হয়। তখন তাকে স্বর্গে আর বসবাস করতে দেয়া হয় না। সে এসে জন্ম নেয় পৃথিবীতে কোনো সাধারণ মানুষের সাধারণ ঘরে। তার স্ত্রীও চ'লে আসে মাটির পৃথিবীতে, জন্ম নেয় কোনো সাধারণ মানুষের কন্যা হয়ে। এক সময় তাদের বিয়ে হয়। স্বর্গের কোনো দেবতা এসে হাজির হয় তাদের সামনে, বলে, 'আমার পুজো তোমরা প্রচার করো পৃথিবীতে।' তারা সে-দেবতার পুজো প্রচার করে মানুষের মধ্যে, এবং এভাবে তারা কাটিয়ে ওঠে তাদের শাপ। অবশেষে একদিন মহাসমারোহে তারা আবার স্বর্গে ফিরে যায় দেবতার মতো।

নানা রকমের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে বাঙলা ভাষায়, সকলের রূপ প্রায় একই রকম। একই বিষয়ে অসংখ্য কবি কাব্য লিখেছেন। তাই কালে কালে এ-কাব্যগুলো হয়ে উঠেছিলো ক্লান্তিকর। কাব্যগুলোর নাম হতো যে-দেবতার পুজো প্রচারের জন্যে কাব্যটি রচিত, সে-দেবতার নামানুসারে। তাই চণ্ডীর পুজো প্রচারের জন্যে যে-মঙ্গলকাব্য, তার নাম 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য', মনসা দেবীর পুজো প্রচারের জন্যে যে-কাব্য রচিত, তার নাম 'মনসামঙ্গলকাব্য। শিবের পুজো প্রচারের জন্যে যে-কাব্য তার নাম 'শিবমঙ্গলকাব্য'। এ-রকম আরো অনেক মঙ্গলকাব্য রয়েছে; যেমন— 'অন্নদামঙ্গলকাব্য', 'ধর্মমঙ্গলকাব্য', 'কালিকামঙ্গলকাব্য', 'শীতলামঙ্গলকাব্য' ইত্যাদি। একই বিষয়ে অসংখ্য কবি কাব্য লিখেছেন। ধরা যাক চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কথা। একজন বা দুজন কবি যদি এ-বিষয়ে কাব্য

লিখতেন, তাহলে বেশ হতো। কিন্তু এ-একই বিষয়ে কাব্য রচনা করেছেন অসংখ্য কবি, যাঁদের সকলের নামও আজ আর জানা নেই। সেকালে কবিরা নিজেরা মৌলিক গল্প বানাতেন না, পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া গল্প নিয়ে মেতে থাকতেন তাঁরা। এতে তাঁদের কোনো মনপীড়া ছিলো না, বরং পূর্বপুরুষের গল্প আবার লিখতে আনন্দ পেতেন সে-কবিরা। অধিকাংশ সময়ে তাঁদের হাতে আগের কাহিনী আরো দুর্বল হয়ে পড়তো। মঙ্গলকাব্যে তা খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে।

যে-সকল কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের কিছু নাম বলছি। মনসামঙ্গলকাব্য লিখেছেন হরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস এবং আরো অনেকে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন মাণিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব, ভারতচন্দ্র রায় প্রমুখ। ধর্মমঙ্গলকাব্য লিখেছেন ময়ূরভট্ট, মাণিকরাম, রূপরাম, সীতারাম, ঘনরাম, এবং আরো বহু কবি। অনেক কবি একই বিষয়ে কাব্য লিখেছেন ব'লে অনায়াসে শ্রেষ্ঠ কাব্যটি প'ড়ে নিলেই হয়, সবগুলো পড়ার কোনো দরকার করে না। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ফিরে ফিরে পুনরুক্তি দেখে মধ্যযুগের ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক কালের একজন বড়ো কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অনেকটা রেগেই বলেছেন, 'বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগ অপাঠ্য।' আসলে কিন্তু একে, মঙ্গলকাব্যকে, অপাঠ্য ব'লে বাতিল ক'রে দেয়া যায় না। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে ভালো কবিতার যদি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে সেকালের জীবনের পরিচয়। বাঙলাদেশের মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে মঙ্গলকাব্য না প'ড়ে উপায় নেই।

মঙ্গলকাব্যগুলো দেবতাদের নিয়ে লেখা। এ-দেবতারা বড়ো নিষ্ঠুর, ভক্তের ওপর তারা সহজেই রেগে ওঠে, রেগে মানুষের ভীষণ সর্বনাশ করে, আবার সামান্য পুজো পেলে খুশিতে বাগবাগ হয়ে ভক্তের গৃহ সোনারুপোয় ছেয়ে দেয়। এ-দেবতাদের আচরণ দেখে মনে হয় এরা আসল দেবতা নয়, অভিজাত দেবতা নয়; এরা নিম্নশ্রেণীর দেবতা, যাদের মানুষ পুজো করতে চায় না। তাই তারাও ক্ষমাহীন, অত্যাচার ক'রে লোভ দেখিয়ে বার বার বিপদে ফেলে তারা মানুষের পুজো ভক্তি আদায় ক'রে নেয়। এদের সাথে অনেকটা মিল আছে আমাদের দেশের এককালের জমিদারদের, যারা মানুষকে উৎপীড়ন ক'রে নিজেদের সম্মান বাড়াতে চাইতো। যেমন মনসাদেবী। তার ছিলো এক চোখ কানা, তার ওপরে সে মেয়ে। তার ইচ্ছে হয় সমাজের অভিজাত চাঁদ সদাগরের পুজো পাওয়ার। চাঁদ সদাগর বিরাট ধনী, সমাজে মান্যগণ্য, তার দেবতাও অভিজাত। সে কিছুতেই রাজি নয়, একচোখ কানা, তার ওপরে মেয়ে, দেবতার পুজো করতে। মনসা রেগে ওঠে, চাঁদের বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে দেয় পানিতে, চাঁদের ছেলে লখিন্দরকে বাসরঘরে মেরে ফেলে। তারপর একদিন সে লাভ করে চাঁদ সদাগরের পুজো।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে চণ্ডীমঙ্গল, আর মনসামঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য লিখেছেন অনেক কবি; তাঁদের মধ্যে দু'জন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের সারিতে আসন পান। তাঁরা হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরায় চক্রবর্তী, এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। মনসামঙ্গলের দুজন সেরা কবি হলেন বিজয়গুপ্ত, এবং বংশীদাস। চণ্ডীমঙ্গলের আছে দুটি চমৎকার কাহিনী; একটি ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরার, অপরটি ধনপতি-লহনার। মনসামঙ্গলের কাহিনী একটি, তা হচ্ছে বেহুলা-লখিন্দরের। কালকেতু ও ফুল্লরার গল্প মনোরম, কীভাবে তারা চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করলো, পুজো প্রচার করলো চণ্ডীর, তারপরে ফিরে গেলো স্বর্গে,

এ-গল্পে তার আনন্দমধুর কাহিনী রয়েছে। কিন্তু বেহুলা ও লখিন্দরের গল্প বড়ো করুণ, পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এ-কাহিনী যিনি প্রথম রচনা করেছিলেন তাঁকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার বলা যায়। এ-গল্পে মানবজীবনের রূপ ভয়াবহ বেদনাকরুণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলকাব্য রচিত পদ্যে, ছন্দে গাঁথা এ-কাব্যগুলো। তবু এগুলো পড়তে পড়তে মনে হয় যেন গদ্য পড়ছি। কবিতায় বেশি কথা বললে তা আর কবিতা থাকে না। কবিতায় আমরা কামনা করি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি বা আবেগ, কবিতায় জীবনের সব কথা সবিস্তারে বলা যায় না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে কবিরা বলেছেন জীবনের প্রতিদিনের সকল কথা, নায়কের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যা কিছু ঘটেছে সবকিছু বলতে চেয়েছেন কবিরা। তাই মঙ্গলকাব্যে লেগেছে গদ্যের ভার, তা হয়ে উঠেছে শ্লথ, পুনরুক্তিময়। এগুলো মধ্যযুগের উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা যায় নায়কনায়িকার জীবনকে বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা, লেখক উপন্যাসে কিছু পরিত্যাগ করতে চান না। নায়ক সুখে আছে বা বেদনায় কাঁপছে, এর সামান্য চিত্র দিলেই উপন্যাসের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, উপন্যাস তার পাত্রপাত্রীদের পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে চায়। মঙ্গলকাব্যগুলোতেও তাই হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর কথা ধরা যাক। কবি মুকুন্দরাম স্বর্গে কালকেতু কী ছিলো, তা বলেছেন, পৃথিবীতে এসে কোথায় জন্ম নিলো, কীভাবে বেড়ে উঠলো, সব বলেছেন। এর ফলে কাব্য দীর্ঘ হয়েছে, কবিতা হয়েও একে মনে হয় গদ্য।

মঙ্গলকাব্যের কবিরা সাধারণত যে-দেবতার নামে কাব্য লিখেছেন, সে-দেবতার ভক্ত ছিলেন। তাই কাব্যের শুরুতে সবাই বর্ণনা করেছেন তাঁরা কেনো কাব্য রচনা করলেন, সে-কথা। সব কবি বলছেন একই রকম কথা। তাঁরা বলেছেন, দেবতা স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন আমাকে কাব্য লিখতে, তাই আমি কাব্য লিখছি। একথা কি আজ বিশ্বাস হয়? বিশ্বাস হয় না। এ ছিলো তখনকার রীতি, দেবতার কথা না বললে মানুষ কাব্য শুনবে না ভেবেই বোধ হয় কবিরা একথা বলতেন। সেকালে কাব্যের উদ্দেশ্য আজকের মতো ছিলো না, কাব্যের জন্যে কাব্য লেখার প্রচলন তখন ছিলো না, ধর্ম প্রচারের জন্যে সবাই কাব্য রচনা করতেন। তাই মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য ধর্মভিত্তিক, দেবতাকেন্দ্রিক। দেবতার কথার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে মানুষ।

চণ্ডীমঙ্গলের সোনালি গল্প

চণ্ডীমঙ্গলের আছে দুটি বেশ চমৎকার গল্প : একটি কালকেতু-ফুল্লরার, অন্যটি ধনপতি-লহনা-খুলনার। চণ্ডীমঙ্গলের গল্প মধুর আনন্দের, বেদনার বদলে এ-গল্পে আছে সুখের কথা। বেদনা যা আছে মাঝেমাঝে, তা শুধু সুখ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে। কালকেতু-ফুল্লরার গল্পটি আমি বলবো। স্বর্গে বেশ সুখে ছিলো নীলাম্বর। ফুল তুলে শিবপুজো ক'রে, নিজের স্ত্রী ছায়াকে ভালোবেসে সুখে সময় কাটাচ্ছিলো নীলাম্বর। কিন্তু ক্রমশ তার ভাগ্যাকাশে দুঃখের মেঘ দেখা দিতে লাগলো। চণ্ডীর ইচ্ছে হয়েছে পৃথিবীতে তার পুজো প্রচারের।

কিন্তু কে করবে তার পুজো প্রচার? চণ্ডী এ-কাজে নীলাম্বরকে মনে মনে মনোনীত করলো। চণ্ডী তার স্বামী শিবকে বললো, নীলাম্বরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, সে পৃথিবীতে আমার পুজো প্রচার করবে। শিব বললো, বিনা অপরাধে আমি তাকে কী ক'রে স্বর্গ থেকে বিদায় দিই? চণ্ডী মনে মনে পরিকল্পনা আঁটলো, সে নীলাম্বরকে পাঠাবেই। একদিন শিবপুজোর জন্যে বাগানে ফুল তুলছিলো নীলাম্বর। চণ্ডী সেখানে গেলো, নিজেকে বিষাক্ত কীটে রূপান্তরিত করলো, এবং নীলাম্বরের তোলা ফুলে গোপনে লুকিয়ে রইলো। ঘনিয়ে এলো নীলাম্বরের স্বর্গ থেকে বিদায়ের দিন। নীলাম্বর ফুল দিয়ে শিবপুজো করতে গেলে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কীট শিবকে দংশন করলো। কীটের কামড়ে শিউরে উঠলো শিব, অভিশাপ দিলো নীলাম্বরকে, 'যাও পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নাও ব্যাধ হয়ে।' শিবের অভিশাপে দেবতা নীলাম্বরের সব দেবত্ব বিলীন হয়ে গেলো। বেচারির নিজের কোনো অপরাধ ছিলো না, তবু দৈব দয়ায় তাকে চ'লে আসতে হলো এ-কষ্টভরা পৃথিবীতে। সে জন্ম নিলো ধর্মকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্র হয়ে। অন্যদিকে তার স্ত্রী ছায়াও চ'লে এলো পৃথিবীতে অন্য এক ব্যাধের কন্যা হয়ে। নীলাম্বরের নাম হলো কালকেতু, আর ছায়ার নাম হলো ফুল্লরা।

কালকেতু ব্যাধের ছেলে, সুন্দর স্বাস্থ্যবান। বনের ভয়ঙ্কর পশুরা তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো। তার বিয়ে হলো এগারো বছর বয়সে ফুল্লরার সাথে। পৃথিবীতেও তারা বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগলো। কালকেতু ছিলো অসাধারণ শিকারী, তার নিক্ষিপ্ত শরে প্রতিদিন প্রাণ হারাতে লাগলো সংখ্যাহীন বনচর পশু। ছোটোখাটো দুর্বল পশুদের তো কথাই নেই, এমনকি বাঘসিংহরাও ভীত হয়ে উঠলো। বনে পশুদের বাস করা হয়ে উঠলো অসাধ্য। পশুরা ভাবতে লাগলো কী ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় এ-শিকারীর শর থেকে। সব পশু একত্র হয়ে ধরলো তাদের দেবী চণ্ডীকে; বললো, বাঁচাও কালকেতুর শর থেকে। চণ্ডী বললো, বেশ। শুরু হলো চণ্ডীর চক্রান্ত। কালকেতুকে অস্থির ক'রে তুললো সে নানাভাবে। কালকেতু জীবিকা নির্বাহ করে পশু মেরে। একদিন সে বনে গিয়ে দেখলো বনে কোনো পশু নেই। চণ্ডী সেদিন ছল ক'রে বনের পশুদের লুকিয়ে রেখেছিলো। সেদিন কালকেতু কোনো শিকার পেলো না, না খেয়ে তাকে দিন কাটাতে হলো। পরদিন আবার সে তীরধনুক নিয়ে শিকারে গেলো। পথে দেখলো সে একটি স্বর্ণগোধিকা অর্থাৎ গুইসাপ। এ-জিনিশটি অলক্ষুণে; তাই কালকেতু চিন্তিত হয়ে পড়লো। রেগে উঠলো কালকেতু। সে গোধিকাটিকে বেঁধে নিলো। মনে মনে ভাবলো, আজ যদি কোনো শিকার না মেলে তবে এটিকেই খওয়া যাবে।

সেদিন কোনো শিকার মিললো না তার। সে গোধিকাটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো তার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে ফুল্লরা। কিছু রান্না হয় নি। গতকাল তারা খেতে পায় নি, আজো খেতে পাবে না। কালকেতুকে শিকারহীন ফিরে আসতে দেখে প্রায় কেঁদে ফেললো ফুল্লরা। কালকেতু ফুল্লরাকে বললো, এ-গোধিকাটিকে আজ রান্না করো, পাশের বাড়ির বিমলাদের থেকে কিছু খুদ এনে রাঁধ, আমি হাটে যাচ্ছি। এ বলে কালকেতু চ'লে গেলো। তার পরেই এলো বিস্ময়, ঘটলো অভাবনীয় ঘটনা। গোধিকাটি আসলে ছিলো দেবী চণ্ডী। ফুল্লরা বিমলাদের বাড়িতে যেতেই সে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করলো। বিমলাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে নিজের আঙ্গিনায় এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখে অবাক হয়ে গেলো ফুল্লরা। সাথে সাথে হলো ভীতও। ফুল্লরা তাকে তার পরিচয়

জিজ্ঞেস করলো। দেবী চণ্ডী ছলনাময়ী, শুরু করলো তার ছলনা। সরলভাবে বললো, কালকেতু আমাকে নিয়ে এসেছে।

একথা শুনে ভয় পেলো ফুল্লরা। এতোদিন সে স্বামীকে নিয়ে সুখে ছিলো, ভাবলো এবার বুঝি তার সুখের দিন ফুরোলো। ফুল্লরা অনেক বুঝালো যুবতীটিকে। বললো, তুমি খুব ভালো, তুমি খুব সুন্দরী। তুমি তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে যাও, নইলে মানুষ নানা কথা বলবে। কিন্তু যুবতী ফুল্লরার কথায় কোনো কান দিলো না; বললো, আমি এখানে থাকবো। এতে কেঁদে ফেললো ফুল্লরা, দৌড়ে চ'লে গেলো হাটে কালকেতুর কাছে। বললো সব কথা। শুনে কালকেতুও অবাক। সে বাড়ি ফিরে এলো ফুল্লরার সাথে, এবং যুবতীকে দেখে অবাক হলো। কালকেতু বার বার তাকে বললো, তুমি চ'লে যাও। কিন্তু কোনো কথা বলে না যুবতী। তাতে রেগে গেলো কালকেতু, তীরধনুক জুড়লো, যুবতীকে সে হত্যা করবে। যখন কালকেতু তীর নিক্ষেপ করতে যাবে তখন ঘটলো আরো বিস্ময়কর এক ঘটনা। এবার দেবী চণ্ডী নিজের মূর্তিতে দেখা দিলো। সে-আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে পরিণত হলো দেবী চণ্ডীতে। চোখের সামনে এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দেখে ব্যাধ কালকেতু মুগ্ধ হয়ে গেলো। চণ্ডী বললো, তোমরা আমার পুজো প্রচার করো, আমি তোমাদের অজস্র সম্পদ দেবো, রাজ্য দেবো। রাজি হলো কালকেতু-ফুল্লরা। অবশ্য দেবীর কথা প্রথমে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি ফুল্লরা, কেননা এ ছিলো অভাবিত। দেবী সাথে সাথে সাত কলস ধন দান করলো। কালকেতু ছিলো একটু বোকাসোকা মানুষ। অভাবিত ধন পেয়ে কালকেতু বোকার মতো ব্যবহার করেছে, তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কবি মুকুন্দরাম। কিছু অংশ তুলে আনছি :

এক ঘড়া অবশেষে দেখি মহাবীর।
নিতে নারে দৌড়ি আর হইল অস্থির ॥
মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহির চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন॥
যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর।
এক ঘড়া ধন মাগো নিজ কাঁখে কর ॥
অস্থির দেখিয়া বীর ভাবেন অভয়া।
ধন ঘড়া কাঁখে কৈলা বীরে করি দয়া ॥
আগে আগে মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন গড়া লয়ে পাছে পালায় পার্বতী ॥

কালকেতু বাঁকে করে দু-ঘড়া ক'রে ধন নিয়ে যাচ্ছে তার বাড়িতে। ওপরের ঘটনাটি হচ্ছে তৃতীয় বার যখন সে ধন নিতে এসেছে তখনকার। সে দেখে এক ঘড়া ধন বাকি থেকে যাচ্ছে। দেবীকে ধন পাহারায় রেখে যেতে তার সাহস হচ্ছে না। তাই দেবীকে সে বলছে, যদি এ-ধন তুমি আর কাউকে না দিতে চাও, তবে একটু কাঁখে ক'রে এক ঘড়া ধন তুমি নিজেই আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও। দেবী তাতে রাজি হয়। কালকেতু আগে আগে

যায়, দেবী যায় পাছে পাছে। কালকেতুর মনে বড়ো ভয় যদি দেবী ধন নিয়ে পালিয়ে যায়! একটু বেশ নির্বোধ না হ'লে কেউ কি এমন কথা ভাবে!

কালকেতু এ ধনে ধনী হয়ে গুজরাটে বন কেটে বিরাট নগর নির্মাণ করলো। সেখানে ছিলো ভাড়ুদত্ত নামের এক দুষ্ট লোক। দুষ্টরা মন্ত্রী হ'তে চায় চিরকালই, সেও এসে কালকেতুর মন্ত্রী হ'তে চাইলো। কালকেতু তাতে রাজি হলো না। এতে ভাড়ুদত্ত ক্ষেপে গেলো। সে চ'লে গেলো কলিঙ্গে, সেখানকার রাজাকে নানা কিছু বুঝিয়ে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি করালো। বেধে গেলো যুদ্ধ। কালকেতু আগে ছিলো ব্যাধ, এখন রাজা। সে যুদ্ধ জানে না। তাই যুদ্ধে হেরে গেলো, এসে পালিয়ে রইলো, বউয়ের পরামর্শ মতো, ধানের গোলার ভেতরে। কলিঙ্গরাজ তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলো, কারাগারে বন্দী ক'রে রাখলো। ব্যাধ কালকেতু দেবীর বরে রাজা হয়েছিলো, এখন সে বন্দী। কারাগারে কালকেতু স্মরণ করলো দেবী চণ্ডীকে।

চণ্ডী কালকেতুর ওপর সব সময় সদয়, কেননা কালকেতু তার ভক্ত। দেবী কলিঙ্গের রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিলো। বললো, কালকেতু আমার ভক্ত, তাকে মুক্তি দাও, তার রাজ্য ফিরিয়ে দাও। কলিঙ্গরাজ দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মুক্তি দিলো কালকেতুকে, ফিরিয়ে দিলো তার রাজ্য। কালকেতু তার রাজ্যে ফিরে এসে আবার রাজা হলো, রাজত্ব করতে লাগলো বেশ সুখে। ফুল্লরা তার সুখী রানী। অনেক দিন রাজত্ব ক'রে বৃদ্ধ হলো কালকেতু আর ফুল্লরা, এবং এক শুভদিনে মহাসমারোহে আবার নীলাম্বর-ছায়ারূপে ফিরে গেলো স্বর্গে।

মনসামঙ্গলের নীল দুঃখ

চাঁদসদাগর আগে ছিলো স্বর্গে। স্বর্গে শোনা যায় সবাই সুখে থাকে, চাঁদসদাগরও ছিলো। কিন্তু কপালে তার সুখ সইলো না। একদিন অকারণে মনসা দেবী রেগে উঠলো চাঁদের ওপর, অভিশাপ দিলো, স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেয়ার। চাঁদ ছিলো গর্বী আত্মবিশ্বাসী পুরুষ। সেও ধমকে এলো মনসাকে; আমি যাচ্ছি পৃথিবীতে, কিন্তু আমি যদি সেখানে তোমার পুজো না করি তবে সেখানে কেউ তোমার পুজো করবে না। আরম্ভ হলো দুজনার বিরোধ, এ-বিরোধে চাঁদের জীবন হয়ে উঠলো বেদনায় নীল।

চাঁদ মর্ত্যে এসে জন্ম নিলো। তার স্ত্রীর নাম হলো সনকা। চাঁদ পুজো করে শিবের আর গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে সনকা পুজো করে মনসার। চাঁদ একদিন দেখে ফেললো স্ত্রীর মনসাপুজো; রেগে লাথি দিয়ে ফেলে দিলো মনসার মঙ্গলঘট। মনসা খুব রাগী দেবী, চাঁদের ব্যবহারে জ্ব'লে উঠলো অগ্নিশিখার মতো। সে চাঁদসদাগরের ওপর প্রতিশোধ নিতে হলো বদ্ধপরিকর। চাঁদসদাগরের একটি বাড়ি ছিলো স্বর্গের উদ্যানের মতো সুন্দর; সেটি ধ্বংস ক'রে দিলো মনসা। রাজ্যের দিকে দিকে দেখা দিলো সাপের অত্যাচার। মনসা হলো সাপের দেবী, সে তার সাপবাহিনীকে লাগিয়ে দিলো চাঁদের বিরুদ্ধে। চাঁদের এক বন্ধু একদিন সাপের কামড়ে মারা গেলো, চাঁদ বিমর্ষ হয়ে পড়লো। মানসার ক্রোধে আরো মৃত্যু দেখা দিলো চাঁদের বাড়িতে। তার ছ-জন শিশুপুত্রকে মেরে ফেললো মনসা। মনসা এসে

হাজির হলো চাঁদের কাছে; বললো, আমার পুজো করো, আমি সব ফিরিয়ে দেবো। চাঁদ তবুও অটল, কিছুতেই সে পুজো করবে না মনসার। বরং সে মনসাকে আরো অপমান করলো, মনসাকে সে লাঠি নিয়ে তাড়া করলো, লাঠির আঘাতে ভেঙে গেলো মনসার কাঁকালি। সনকা এসে পায়ে পড়লো চাঁদ সদাগরের; বললো, তুমি মনসার পুজো করো, তাহলে আমি ফিরে পাবো আমার সন্তানদের। তবু চাঁদ অটল, সন্তান ও ধনের চেয়ে সম্মান তার কাছে বড়ো।

সনকার দুঃখ তার কোনো পুত্র নেই, যারা ছিলো তারা ম'রে গেছে। সে গোপনে মনসার স্তব ক'রে পুত্র মেগে নিলো। তবে মনসা বললো, এ-পুত্র বিয়ের রাত্রেই সাপের কামড়ে মারা যাবে। চাঁদসদাগর চোদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে বের হলো বাণিজ্যে। তখন আবার এলো মনসা, তার পুজো করতে বললো। এবারও চাঁদ তাকে অপমান ক'রে বিদায় দিলো। চাঁদ বিদেশে গিয়ে চোদ্দ ডিঙ্গা ভ'রে পণ্য কিনলো, যাত্রা করলো গৃহাভিমুখে। তখন আবার মনসা এসে দাবি করলো পুজো। চাঁদ আগের মতো আবার তাকে অপমান করলো। তাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো মনসা, চাঁদের ওপরে প্রতিশোধ না নিলে তার জ্বালা জুড়োবে না। চাঁদের ডিঙ্গা আসছিলো সমুদ্রপথে, মনসার আদেশে হঠাৎ জেগে উঠলো সামুদ্রিক বাতাস, ক্ষেপে উঠলো বজ্রবিদ্যুৎ। চারদিকে উত্তাল ঝড়ের দোলা, বাতাসের তাণ্ডব। চাঁদের পণ্যভরা ডিঙ্গাগুলো একটির পর একটি ডুবে গেলো সমুদ্রের জলে। চাঁদ ভাসতে লাগলো সমুদ্রে। এগিয়ে এলো মনসা, চাঁদকে সে মারতে চায় না, চায় চাঁদের পুজো। মনসা একটি আশ্রয় করার মতো বস্তু ভাসিয়ে দিলো চাঁদের দিকে। চাঁদ প্রায় সেটিকে ধরতে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার মনে হলো এটি মনসার দান। তাই সে ওই আশ্রয় গ্রহণ করলো না। ভীষণ বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী পুরুষ চাঁদসদাগর। যাকে সে ঘৃণা করে তার দয়ায় বাঁচার ইচ্ছা নেই তার। সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এক সময় চাঁদসদাগর তীরে এসে পৌঁছোলো। নানা দুঃখে কেটে গেলো তার জীবনের বারোটি বছর। স্বদেশ স্বগৃহ থেকে দূরে কাটলো তার এ-সময়; তার ধন নেই, ডিঙ্গা নেই, গৃহ নেই। অভিজাত ধনী চাঁদসদাগর বারো বছর পরে ভিক্ষুকের মতো ফিরে এলো নিজ ঘরে। মনসার অত্যাচারের সে এক করুণ শিকার। তবু সে বিচলিত হওয়ার পাত্র নয়, কোনো অত্যাচারকে সে চরম ব'লে ভাবে না। সে ভেঙে পড়ে না। এমন অসাধারণ লোক চাঁদসদাগর।

দেশে ফিরে এসে দেখে সে যে-শিশুপুত্র রেখে গিয়েছিলো, সে পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে। নাম তার লখিন্দর। একমাত্র পুত্রের মুখ দেখে সুখী বোধ করলো চাঁদ। চাঁদ অসীম আশাবাদী, পরাজয়হীন তার চিত্ত। লখিন্দর সুন্দর যুবক। চাঁদ নিজের পুত্রের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলো। সুন্দরী পাত্রী মিললো উজানিনগরে। মেয়ের নাম বেহুলা। বেহুলা নানা গুণে উজ্জ্বল মেয়ে। চাঁদ জানে বিয়ের রাতে বাসরঘরে সাপের কামড়ে লখিন্দরের মৃত্যু হবে। চাঁদ চায় এ-মৃত্যুকে ঠেকাতে। সে ডেকে আনলো শিল্পীদের; তৈরি করতে বললো ছিদ্রহীন লোহার বাসর, যাতে কিছুতেই ঢুকতে না পারে সাপ। চাঁদ যেমন উদ্যমপরায়ণ, মনসাও তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে শিল্পীদের স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললো ছিদ্র রাখতে, নইলে তাদের ভাগ্যে আছে মৃত্যু। বিয়ে হয়ে গেলো লখিন্দর-বেহুলার। বাসর রাতে ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ ক'রে বেহুলার দীর্ঘ কেশ বেয়ে শয্যায় উঠলো মনসার দূত সাপ। কামড়ে দিলো। মৃত্যু হলো লখিন্দরের।

সাপের কামড়ে যারা মরে, তাদের ভাসিয়ে দেয়া হয় ভেলায় ক'রে নদীর জলে। অনেক রোদনের মধ্যে দিয়ে লখিন্দরকেও ভেলায় ক'রে ভাসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। বেহুলা এবার বেদনা থেকে উঠে বসলো, হলো পাথরের মতো শক্ত; বললো সেও যাবে ভেলায় ক'রে তার স্বামীর সাথে। সে ফিরিয়ে আনবে তার স্বামীকে স্বর্গলোক থেকে। বেহুলা সুন্দর, যেমন আনন্দে তেমনি বেদনায়, তেমনি প্রতিজ্ঞায়। কারো কথা সে মানলো না। স্বামীর সাথে সে উঠে বসলো ভেলায়। নদীর নাম গাঙুর, ভেসে চলছে লখিন্দরের ভেলা, মৃত স্বামীর পাশে ব'সে আছে বেহুলা একরাশ বেদনার মতো। দিনে দিনে শরীর থেকে ঝ'রে যাচ্ছে লখিন্দরের মাংস আর নদীর স্রোতে ভেসে চলছে ভেলা। ভেলা ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে যায়। বেহুলার সামনে আসে নানা বিপদ, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেহুলা সে-সব জয় করে। তার মধ্যে আছে জয়ের বীজ, জয় তার ভাই।

ভাসতে ভাসতে ভেলা এসে পৌছোলো এক ঘাটে, যেখানে প্রতিদিন স্বর্গের ধোপানি কাপড় ধোয়। বেহুলা একদিন এক অবাক কাণ্ড দেখলো। ধোপানি কাপড় ধুতে এসেছে একটি ছোটো শিশু নিয়ে। শিশুটি দুরন্ত, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে। ধোপানি এক সময় শিশুটিকে একটি আঘাত ক'রে মেরে ফেললো। পরে যখন কাপড় কাচা হয়ে গেলো, তখন আবার সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন বেহুলা গিয়ে তার পদতলে পড়লো, তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। ওই ধোপানির নাম নেতা। সে বললো, একে আমি বাঁচাতে পারবো না, কেননা একে মেরেছে মনসা। তুমি স্বর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও। দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। তুমি যদি তোমার নাচ দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে পারো, তাহলে তারা তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবে।

আশার মোম জ্বলে উঠলো বেহুলার চোখে, মনে, সারা চেতনায়। সে স্বর্গে গেলো। দেবতারা ব'সে আছে; তাদের সামনে বেজে উঠলো বেহুলা, বেজে উঠলো তার পায়ের নূপুর। বেহুলার নাচে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারদিক, তার নূপুরের ধ্বনিতে ভ'রে গেলো স্বর্গলোক। বেহুলার নৃত্যে এক অসাধারণ ছন্দ। মুগ্ধ হলো দেবতারা। তারা বেহুলাকে বর প্রার্থনা করতে বললো। সে তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলো। মহাদেব রাজি হলো তাতে। মনসা এসে বললো, আমি লখিন্দরকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি চাঁদ আমার পুজো করে। বেহুলা তাতে রাজি হলো, এবং বললো, তাহলে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আমার শ্বশুরের সব কিছু। ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর পুত্রদের, তাঁর সমস্ত বাণিজ্যতরী। রাজি হলো মনসা।

মনসা সব ফিরিয়ে দিলো, বেঁচে উঠলো লখিন্দর, ভেসে উঠলো চোদ্দ ডিঙ্গা। চাঁদ পাগলের মতো ছুটে এলো বেহুলার কাছে। কিন্তু এসে যেই শুনলো যে তাকে মনসার পুজো করতে হবে, তখন তার সকল আনন্দ নিভে গেলো, সে দৌড়ে স'রে গেলো সবকিছুর থেকে। বেহুলা গিয়ে কেঁদে পড়লো চাঁদের পায়ে। যে-চাঁদ মনসাকে চিরদিন অপমান করেছে, যে কোনোদিন পরাজিত হতে চায় নি, সে-চাঁদ বেহুলার অশ্রুর কাছে পরাজিত হলো। বেহুলা বললো, তুমি শুধু বাঁ হাতে একটি ফুল দাও, তাহলেই খুশি হবে মনসা। চাঁদ বললো, আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে ফুল দেবো। তাই হলো। মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে একটি ফুল হেলাভরে ছুঁড়ে দিল চাঁদ। আর পৃথিবীতে প্রচারিত হলো মনসার পুজো।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবির নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের নাম *চণ্ডীমঙ্গলকাব্য।* কবির উপাধি ছিলো কবিকঙ্কন, উপাধিটি চমৎকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি; তাঁর কাব্য বাঙলা সাহিত্যে গর্বের ধন। কিন্তু এ-মহান কবি সম্বন্ধে আমরা জানি কতোটুকু? খুব সামান্য। কবি কাব্যের শুরুতে তাঁর জীবনকাহিনী বলেছেন। এ-কাহিনী সংক্ষিপ্ত, কবির সকল পরিচয় জানা যায় না। তবু আমাদের পিপাসা মেটাতে হয় কবির স্বরচিত সে-সামান্য কাহিনীর ঠাণ্ডা জলেই। তাঁর বইতে যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় কবির জন্ম হয়েছিলো ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে, আর তিনি কাব্য লিখেছিলেন ১৫৭৫ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কবির জীবনের যে-সামান্য কাহিনী আমরা জানি তাতে বিস্মিত হবার মতো কোনো উপাদান নেই। মনে হয় কবি ছিলেন সহজ সরল, তাঁর সারাটি জীবন কেটেছে শাদামাটাভাবে। শুধু তাঁর জীবনের শুরুতে দেখা দিয়েছিলো কিছুটা সংঘাত। কবির নিজের ভাষায় সে কাহিনীর কিছুটা :

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ এই গীত হইল যেন মতে।
উড়িয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, চণ্ডিকা বসিল আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুতে বসি দামিন্যায় চাষ চষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥

কবি বলছেন, ভাইয়েরা শোনো, আমি কী ক'রে কবি হলাম। শুয়ে ছিলাম আমি, হঠাৎ আমার শিয়রে এসে বসলো দেবী চণ্ডী। আমাকে তাঁর গান রচনা করতে বললো। এটুকু ব'লে কবি শুরু করেন তাঁর জীবনকাহিনী। সিলিমবাজ নামে এক শহর ছিলো, তার জমিদার গোপীনাথ নিয়োগী। কবির বসবাস গোপীনাথের তালুকে, দামুন্যা গ্রামে। কবির পূর্বপুরুষেরা অনেক দিন ধ'রে এ-গ্রামে বসবাস ক'রে আসছেন। তারপর এলো মানসিংহের রাজত্ব, গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের সে রাজা। তার সময়ে কবির গ্রামের ডিহিদার হলো মামুদ শরিফ। সে ছিলো বড়ো অত্যাচারী। কবি তার অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। মামুদ শরিফ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সকলের সাথে শত্রুতা করতে লাগলো। সে জমির মাপ নিতে লাগলো জমির কোণ থেকে কোণে দড়ি ধ'রে, তাতে জমির আয়তন বেশি মাপা হ'তে লাগলো। পনেরো কাঠায় এক কুড়া ধরতে লাগলো। সে প্রজাদের কোনো অভিযোগ শোনে না।

বেশ দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন কবি। কবি আর তাঁর পরিবারের চিরদিনের বসবাস যে-গ্রামে, যে-গৃহে, সেখানে থাকতে পারলেন না। গ্রাম ছেড়ে তিনি পালালেন। তাঁর সাথী হলো পরিবারের লোকজন, আর ভাই রামানন্দ ও অনুচর দামোদর নন্দী। নদী বেয়ে এগোতে লাগলেন গন্তব্যহীন কবি। পথে দেখা দিলো বিপদ, কবি পড়লেন রূপরায় নামক এক ডাকাতের কবলে। রূপরায় কবির সব কিছু হরণ করলো। কবিকে আশ্রয় দিলেন

যদুকুণ্ডু নামে এক লোক। কবি আবার যাত্রা শুরু করলেন, তাঁর নৌকো চলছে গোড়াই নদী বেয়ে, এসে পৌঁছোলেন একদিন তেউট্যা নামক এক স্থানে। এর পরে আবার শুরু হলো নৌযাত্রা, এবারের নদীর নাম দারুকেশ্বর। কবি পৌঁছোলেন বাতনগিরিতে, সেখান থেকে গেলেন কুচুট শহরে। কবির জীবনটা এ-সময়ে দুঃখে ভরা; —আহার নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই। এ-কুচুট শহরেই কবিকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে চণ্ডী কবিতা রচনা করতে বললো। এরপর কবি আসেন আড়রা গ্রামে, সেখানে এসে কবি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এ-এলাকার জমিদার বাঁকুড়া রায়। সে বেশ ভালো লোক, কবিকে আশ্রয় দিলো। জমিদারের ছিলো এক পুত্র, নাম রঘুনাথ। কবি রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুনাথ হলো জমিদার, আর তার সময়েই কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লেখেন অমর কাব্য *চণ্ডীমঙ্গল*।

কবির পিতামহের নাম ছিলো জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, বড়ো ভাইয়ের নাম কবিচন্দ্র। তাঁর পুত্রের নাম শিবরাম, মেয়ের নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা। এসব পাওয়া গেছে তাঁর নিজের লেখা জীবনকাহিনীতেই। কবি মুকুন্দরাম বড়ো কবি। তাঁর কবিতা অবশ্য কবিতা বলতে আমরা যে হৃদয়মাতানো, মনভোলানো জিনিশ বুঝি, তা নয়। তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য হচ্ছে মধ্যযুগের উপন্যাস। তিনি জীবনের বাস্তব দিক এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে বিস্মিত হ'তে হয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কল্পনা করতে জানতেন না, খুব চতুর ঝকঝকে কথা বলতে জানতেন না; তিনি ছিলেন একজন বড়ো দর্শক। তাঁর চারপাশে যা তিনি দেখতে পেতেন, তাই তিনি লিখতেন। এজন্যে তাঁর কাব্যে বাস্তবের বর্ণনা খুব পরিচ্ছন্ন। তিনি চারপাশে দেখেছেন কালকেতুর মতো সহজ-সরল নির্বোধ ধরনের পুরুষ; দেখেছেন ফুল্লরার মতো শ্রীময়ী গৃহিণী। দেখেছেন মুরারি শীলের মতো ধূর্ত বণিক এবং ভাঁড়ুদত্তের মতো ভণ্ড। এদের তিনি বাস্তব জগতে যেমন হয়, তেমন ক'রে সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যে জীবন্ত হয়ে আছে কয়েকটি চরিত্র। উপন্যাসেই চরিত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে, কবিতায় নয়। এজন্যে অনেকে বলেন, কবি মুকুন্দরাম যদি মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ না ক'রে আধুনিক কালে জন্মাতেন, তবে তিনি কবি না হয়ে হতেন ঔপন্যাসিক। কেমন ঔপন্যাসিক? বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কল্পনাপ্রধান ঔপন্যাসিক নয়, হতেন শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাস্তবতার শিল্পী। তিনি যে মানুষকে চিনেছিলেন ভালোভাবে। কালকেতু দেবীর কৃপায় অনেক ধন পেয়েছে। কালকেতু জীবনে সোনা দেখে নি। সে সোনা লাভের পর সোনা ভাঙাতে যায় মুরারি শীল নামের এক বেণের কাছে। বেণে চতুর, কালকেতু বোকা। বেণে ভাবলো, দেখি না একটু বাজিয়ে যদি কালকেতুকে ঠকাতে পারি। তাই বেণে মুরারি শীল বললো :

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥

মুরারি বলছে, এ সোনারুপো নয়, পেতল। তুমি একে ঘ'ষেমেজে উজ্জ্বল ক'রে এনেছো। কালকেতু বললো, এ আমি দেবীর কাছ থেকে পেয়েছি। কবির ভাষায় :

কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অংগুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া।

তখন বেণের টনক নড়ে। সে তো চিনেছে এ-সোনার মতো সোনা হয় না। তাই বেণে শেষে সোনা রেখে দেয়। এভাবে দেখা যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর সকল পাত্রপাত্রীকে জীবন্ত করে এঁকেছেন, মধ্যযুগে এর তুলনা বেশি পাই না।

কবি মুকুন্দরামের আরো একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য তিনি নির্বিকার। কবিরা আবেগে ফেটে পড়ে, বেদনায় কাতর হয়। কিন্তু এ-কবি অন্য রকম; আবেগ তাঁকে বিহ্বল করে না, বেদনা তাঁকে কাতর করে না, সুখ তাঁকে উল্লসিত করে না। কবি সব সময় সমান নির্বিকার, তিনি সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন। এ হচ্ছে একজন উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিকের গুণ। ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন না, তিনি থাকেন ওই আনন্দবেদনার জগৎ থেকে দূরে। মুকুন্দরামও তেমনি।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলকাব্য-এর* প্রথম অংশের নায়ক কালকেতু, নায়িকা কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা। এ-কাব্যে আছে আরো অনেক পাত্রপাত্রী; যেমন, মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, কলিঙ্গের রাজা। আছে বনের পশুরা, যাদের আচরণ একেবারে মানুষের মতো। পশুরা যখন দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায় কালকেতুর বিরুদ্ধে, তখন মনে হয় গরিব জনসাধারণ অভিযোগ জানাচ্ছে রাজার কাছে। কবি মুকুন্দরামের কাব্য প'ড়ে মনে হয় তিনি ছিলেন সহজ সরল সুখী রাষ্ট্রব্যবস্থাকামী। কালকেতু যখন রাজ্য স্থাপন করে তখন চাষী বুলান মণ্ডলকে সে যে-কথা বলে, তাতে এর পরিচয় আছে। ওই অংশ তুলে দিচ্ছি :

আমর নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বহি দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শংকা
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ী রয়ে বসে দিও কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামি কি বাঁশগাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে ॥

কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলছে, তুমি আমার নগরে এসে ইচ্ছেমতো জমি চাষ করো। তিন বছর পরপর কর দিয়ো। তুমি কর দেবে হালপ্রতি মাত্র এক টাকা। যখন ফসল পাকবে তখন আমার লোকেরা কোনো অত্যাচার করবে না তোমাকে, এদেশে কোনো ডিহিদার থাকবে না। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে কবি গ্রাম ছেড়েছিলেন; তাই তিনি কালকেতুর রাজ্যে কোনো ডিহিদার রাখেন নি। গুজরাটে কোনো ওপরি কর থাকবে না। কবি চেয়েছিলেন সুখী সাধারণ জীবন, যে-জীবন তাঁর দেশের মানুষ কখনো পায় নি।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

দেবী অন্নদা নদী পার হলো ঈশ্বরী পাটনির খেয়ানৌকোয়। তীরে নেমে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বর চাও তুমি, মাঝি? যা চাও তাই পাবে।' মাঝি গরিব মানুষ, খেয়া পারাপার ক'রে তার জীবন চলে। মাঝি দেবীর কাছে চাইতে পারতো রাজ্য, বাড়িভর্তি সোনারুপো, মুক্তোপান্না। তার অভাবের দিন কেটে যেতো দেবীর দয়ায়। মাঝি ওসব কিছু চাইলো না, সে দেবীর কাছে নিবেদন করলো একটি ছোটো প্রার্থনা। বললো, 'আমার সন্তান যেনো থাকে দুধে ভাতে।' মাঝির এ-প্রার্থনার মধ্যে আমরা মধ্যযুগের আঠারোশতকের জীবনের পরিচয় পাই। যে-কবি এ-পংক্তিটি রচনা করেছেন, তিনি মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। নাম ভারতচন্দ্র রায়; উপাধি রায়গুণাকর।

ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন আঠারোশতকের প্রথম দিকে, আনুমানিক ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মধ্যযুগের আরেক বড়ো কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর থেকে প্রায় দুশো বছরের ছোটো। ভারতচন্দ্র যখন জন্ম নেন, তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে আসছে। আগে সমাজে যে-স্থিরতা ও শান্তি ছিলো, তাও নষ্ট হচ্ছে দিনেদিনে। সাহিত্যের একটি যুগ যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে তখন শেষের বছরগুলোতে দেখা দেয় নানারকম পতন। সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমন। ভারতচন্দ্রের সময়ে সমাজের পতন শুরু হয়েছিলো, তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে আমাদের দেশ দখল করে নেয় শাদা ইংরেজরা। ভারতচন্দ্র এক পতনশীল সমাজের কবি, তবু তিনি প্রতিভাবলে অসাধারণ সাহিত্য রচনা ক'রে গেছেন।

ভারতচন্দ্র বর্ধমানের [বর্তমান হাওড়া জেলা] পেঁড়োবসন্তপুর বা পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ভারতচন্দ্রের জীবন বেশ রোমাঞ্চপূর্ণ। তাঁর জন্মের পরেই তাঁদের পরিবারে নেমে আসে দুর্দিন। ১৭১৩ সালে বর্ধমানের রাজা ভুরসুট আক্রমণ করে, এবং জয় করে নেয় ভবানিপুরের গড়। তখনকার ভুরসুট পরগণায় ছিলো পাণ্ডুয়া গ্রাম। এ-গ্রাম চ'লে যায় বর্ধমানের রাজার অধিকারে। এর ফলে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় হারিয়ে ফেলেন তাঁর জমিজমা, ধনসম্পদ। ভারতচন্দ্রের বয়স যখন দশের মতো তখন তিনি পালিয়ে যান মামাবাড়ি। মামারা যে-গ্রামে বাস করতো, তার নাম নওয়াপাড়া। সেখানে বসবাসের সময়ে তিনি এক পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধান পড়েন। তাঁর পড়াশোনাটা হয়েছিলো বেশ ভালো রকমের, বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন অল্প বয়সেই ভারতচন্দ্র। তিনি বিয়ে করেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে। বিয়ে ক'রে পড়া শেষ ক'রে ভারতচন্দ্র বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে অভিনন্দনের বদলে লাভ করেন তিরস্কার। তখন রাজভাষা ছিলো ফারসি, তাই সমাজে ফারসির মর্যাদা খুব। কেননা ফারসি শিখলে পাওয়া যেতো ভালো চাকুরি। কিন্তু তা না শিখে কবি শিখেছেন মৃতভাষা; সমাজে যার কদর কম, সে সংস্কৃত ভাষা। বাড়ির লোকেরা তাঁকে সারাক্ষণ জ্বালাতে থাকে এজন্যে। ভারতচন্দ্র এতে ক্ষুব্ধ হন। মনস্থির করেন তিনিও ফারসি শিখবেন এবং অনেকের চেয়ে ভালোভাবে শিখবেন। আবার পালান ভারতচন্দ্র, এবার আসেন হুগলি জেলার দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুনশির বাড়িতে, এবং শিখতে থাকেন অর্থকরী রাজভাষা ফারসি। খুব উৎসাহের সাথে শিখতে থাকেন ফারসি ভাষাটি ভারতচন্দ্র। তাঁর শিক্ষক এতে খুব মোহিত হন। রামচন্দ্র মুনশির বাড়িতেই তিনি সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন। ভারতচন্দ্র কবি হন।

ফারসি ভাষাটি ভালোভাবে শিখে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাড়ি ফেরেন। সম্পত্তি দেখাশোনার ভার পড়ে তাঁর ওপর, একাজে তিনি বর্ধমান যান। এখানে ঘটে এক অঘটন, কী এক কারণে কবিকে গ্রেফতার করে বর্ধমানের রাজা। কিন্তু বেশিদিন বন্দী থাকেন নি; পালান তিনি কারাগার থেকে। এমনভাবে পালান যাতে বর্ধমানরাজ তাঁকে আর ধরতে না পারে। পালিয়ে বর্ধমানের রাজার রাজ্যের সীমার বাইরে চ'লে যান কবি, হাজির হন ওড়িষ্যার কটকে। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়ান ওড়িষ্যায়। এর পরে তিনি হন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর বিচিত্র পোশাকে কিছুদিন কাটান ভারতচন্দ্র। কিন্তু আত্মীয়দের হাতে ধরা পড়তে বেশি দেরি হয় নি। সন্ন্যাসীদের সাথে একবার তিনি যাচ্ছিলেন বৃন্দাবনে, পথে হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর গ্রাম। সেখানে তাঁর সাথে দেখা হয় তাঁর কিছু আত্মীয়ের। কবিকে ছাড়তে হয় সন্ন্যাসীর বেশ, ফিরে আসতে হয় আবার সাধারণ মানুষের ভিড়ে। ভারতচন্দ্র আত্মীয়দের হাতে ধরা না পড়লেও একদিন না একদিন সন্ন্যাসীর বেশ ফেলে বাড়ি ফিরে আসতেনই। কেননা তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ছিলো না সন্ন্যাসী হওয়ার বীজ। তিনি বরং সন্ন্যাসীদের উপহাস করতে পারেন। সন্ন্যাসীবেশে দেশেদেশে যখন আর ঘোরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না, ফিরে এলেন দেশে, করতে লাগলেন চাকুরির চেষ্টা।

ফরাশডাঙ্গায় তখন ফরাশি সরকারের বেশ বড়ো কর্মচারী এক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ভারতচন্দ্র গিয়ে ধরলেন তাকে। ইন্দ্রনারায়ণ দেখলো ভারতচন্দ্র ভালো কবি, ছন্দ গাঁথেন অনায়াসে, তাই ভাবলো এঁর হওয়া উচিত কবির চাকুরি। সে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠালো ভারতচন্দ্রকে। ভারতের গুণে মুগ্ধ হলো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র; ভারতচন্দ্রকে নিজের সভাকবি হিশেবে বরণ ক'রে নিলো। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উপাধি দিয়েছিলো 'রায়গুণাকর'। ভারতচন্দ্র কবি হিশেবে লাভ করেন পরম খ্যাতি এবং সাংসারিক জীবনেও তাঁর সাফল্য অনেকের ঈর্ষার বস্তু হয়েছিলো। তিনি মাসিক বেতন পেতেন চল্লিশ টাকা, তাছাড়া পেয়েছিলেন রাজার কাছ থেকে বেশ জমিজমা।

ভারতচন্দ্র ছিলেন হাস্যরসিক। একটি মজার গল্প আছে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে। কবি তাঁর বিখ্যাত কাব্য "বিদ্যাসুন্দর" রচনা শেষ করেছেন। রচনা শেষ করেই তিনি পা বাড়ালেন রাজার উদ্দেশে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিলেন কাব্যটি। রাজা তখন অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত, তাই কাব্যটির পাতা না উল্টিয়ে পাশে রেখে দিলো। ভারতচন্দ্র ব'লে উঠলেন, 'মহারাজ করছেন কী, সব রস যে গড়িয়ে পড়বে!' রাজা তখন অন্য কাজ রেখে চোখের সামনে খুলে ধরলো "বিদ্যাসুন্দর কাব্য", যে-কাব্য বাঙলা ভাষায় নানা কারণে আলোড়ন জাগিয়ে যাচ্ছে আজ দুশো বছর ধ'রে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি, তাই তাঁর কাব্যে আছে চাতুর্য, বুদ্ধির খেলা, আছে পাণ্ডিত্য। তিনি মুকুন্দরামের মতো সহজ সরল নন, সহজ অনুভূতি তাঁকে মুগ্ধ করে না। ভারতচন্দ্র সর্বদা খুঁজেছেন এমন বস্তু যা পাঠককে চমকে দেবে। তিনি কথা বানিয়েছেন ধারালো ক'রে, চকচকে তরবারির মতো। এ-কবির সব কিছুতে আছে বিদ্রূপ, তিনি সকলকে ঠাট্টা ক'রে গেছেন। তাঁর কাব্য একটি, নাম *অন্নদামঙ্গলকাব্য।* কাব্যটির আছে তিনটি ভাগ; এক ভাগের নাম 'অন্নদামঙ্গল', আরেক ভাগের নাম 'বিদ্যাসুন্দর', এবং আরেক ভাগ 'ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী'। ভারতচন্দ্র এ-কাব্যে তাঁর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গুণকীর্তন করতে চেয়েছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কথা মনে হ'লেই মনে পড়ে তাঁর সময়কে। সে-সময় নানা দিক দিয়ে পতিত হচ্ছে, সমাজের ভিত ভেঙে যাচ্ছে, দেশের শাসনব্যবস্থায় নানা বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। কাল যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন কবিরাও নষ্ট হন। ভারতচন্দ্রেরও হয়েছিলো তেমনি। তিনি জীবনকে গভীরভাবে না দেখে দেখেছেন হাল্কাভাবে, বাঁকা দৃষ্টিতে।

তবে তাঁর প্রতিভা ছিলো অসাধারণ। চমৎকার কথা বলায়, ছন্দের আন্দোলন সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই মধ্যযুগে। কথা বলেন তিনি বিস্ময়কর চাতুর্যের সঙ্গে। যেমন মধ্যযুগের সকল কবিই বলেছেন, তাঁর নায়িকা দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী, দেখতে একেবারে চাঁদের মতো। এ নিয়ে তামাশা করেছেন ভারতচন্দ্র। তিনি তাঁর নায়িকার রূপ বর্ণনা করতে এসে দেখলেন, এ বড়ো কঠিন কাজ, কেননা কয়েকশো বছর ধ'রে কয়েকশো কবি ব'লে গেছেন, তাঁদের নায়িকারা দেখতে চাঁদের মতো। তাই ভারতচন্দ্র লিখলেন :

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

এমন চমৎকার কথা তিনি অবিরাম বলেছেন, তাঁর অনেক কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। ছন্দে ছিলো তাঁর অসীম অধিকার, তাই তাঁর কবিতা পড়ার সময়ে বিচিত্র ছন্দের রাজ্যে প্রবেশ করেছি ব'লে মনে হয়।

উজ্জ্বলতম আলো : বৈষ্ণব পদাবলি

মঙ্গলকাব্য থেকে বৈষ্ণব পদাবলিতে আসা হলো একটি গুমোট স্বল্পালোকিত দালানের ভেতর থেকে উজ্জ্বল সবুজ দক্ষিণের বাতাসে মাতাল বনভূমিতে আসা। মঙ্গলকাব্য পড়তে পড়তে ক্লান্তি আসে; কেননা এগুলোর আকার বিরাট, আর এতো অকাব্যিক বিষয় এগুলোতে ইনিয়েবিনিয়ে বলা হয় যে বেশিক্ষণ পড়া যায় না। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলি হচ্ছে কেবল কবিতার রাজ্য, সেখানে বাজে বিষয়ের বাড়াবাড়ি নেই, ভালো কবিতার যা ধন কবিরা এ-কবিতাগুলোতে সে-সব চয়ন করেছেন থরেবিথরে। আর এতো আবেগও যে আছে মানুষের, তা এ-কবিতাগুলো না পড়লে সত্যি বোঝা অসম্ভব। বৈষ্ণব কবিতার জন্যেই অনেক কিছুর নাম শুনলেই আমরা আবেগে কাতর হয়ে পড়ি। কোনো বাঙালি যদি শোনে যমুনা নদীর নাম, বা তমাল তরুর কথা, তাহলে তার পক্ষে কিছুক্ষণের জন্যে হ'লেও আনমনা না হয়ে উপায় থাকে না। এ-বিষয়গুলো বৈষ্ণব কবিরা এতো মধুর-নিবিড় আবেগে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেগুলো স্থান ক'রে নিয়েছে। আমরা অনেকেই তমাল তরু দেখি নি, দেখি নি যমুনা নদী, তবু কেনো এরা আমাদের স্বপ্নে ভ'রে তোলে? এর মূলে আছে বৈষ্ণব কবিতা, যার প্রধান পাত্রপাত্রী রাধা আর কৃষ্ণ। রাধা এবং কৃষ্ণকে নিয়ে মধ্যযুগে সবচেয়ে সৌরভময় ফুল ফুটেছিলো, সে-ফুলের নাম বৈষ্ণব কবিতা।

বৈষ্ণব কবিতা বাঙলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একে যদি আলোর সাথে তুলনা করি তাহলে বলবো মধ্যযুগে এমন আলো আর জ্বলে নি।

চতুর্দশ শতকের শেষ দিক থেকে বৈষ্ণব কবিতা রচিত হ'তে থাকে। এর প্রধান পাত্রপাত্রী রাধা ও কৃষ্ণ। এ-সময়ে বিশেষ কোনো ধর্মীয় আবেগে রচিত হয় নি বৈষ্ণব পদাবলি। ১৪৮৬ অব্দে জন্ম নেন চৈতন্যদেব [১৪৮৬—১৫৩৩]। তিনি প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং তাঁর পর থেকে এ-কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। অসংখ্য কবি রচনা করেছেন বৈষ্ণব কবিতা, সকলের নামও আমরা জানি না। কেবল বৈষ্ণব কবিরাই এ-কবিতা রচনা করেন নি, অনেক মুসলমান কবিও রয়েছেন, যাঁরা পরম আবেগে চমৎকার বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। অনেক কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ভক্ত কবি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন [১৮৬৬—১৯৩৯] ১৬৫ জন বৈষ্ণব কবির নাম জানিয়েছেন আমাদের। এ ছাড়াও ছিলেন আরো অনেক কবি, যাঁদের নাম কালস্রোতে হারিয়ে গেছে। কোনো কোনো বৈষ্ণব কবি আবার বেশ মজার কাজ করেছেন। তাঁরা খ্যাতি কামনা করেন নি, তাঁরা চেয়েছেন নিজেদের রচিত কবিতাকে শুধু আমোদের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিতে। তাই তাঁরা কবিতায় নিজেদের নাম ব্যবহার না ক'রে ব্যবহার করেছেন কখনো ছদ্মনাম, কখনো ব্যবহার করেছেন পূর্ব্ববর্তী কোন মহৎ কবির নাম। তাই তাঁদের আর পৃথক ক'রে আজ চেনা যায় না। কয়েকজন কবি আছেন অতি বিখ্যাত কবি, বৈষ্ণব কবিতার কথা উঠলেই তাঁদের নাম মনে আসে। তাঁরা হচ্ছেন বিদ্যাপতি [জন্ম ১৩৭৪], চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস [জন্ম ১৫২০—১৫৩৫], গোবিন্দদাস [১৫৩৪—১৬১৩]। বৈষ্ণব কবিতার তাঁরা চার মহাকবি। আরও যে অনেক কবি আছেন, তাঁদের কিছু নাম : অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, নরোত্তম দাস, নাসির মামুদ, বলরাম দাস, বৈষ্ণব দাস, লোচন দাস, শ্যাম দাস, সেখ জালাল, শেখর রায়, তুলসী দাস। বৈষ্ণব কবিতা ছোটোছোটো। কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের মনের কথা এ-কবিতাগুলোতে বলেছেন। মনের কথা মানেই হলো আবেগ, সুখের আবেগ, বেদনার আবেগ। আসলে এ-কবিতাগুলোতে রাধাকৃষ্ণের নামে কবিদের মনের আবেগ লক্ষধারায় প্রবাহিত হয়েছে। আর কে না জানে যে ভালো কবিতার বিষয় হলো মনের কথা? মধ্যযুগে এ-রকম আর দেখা যায় নি। মঙ্গলকাব্য পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় যে মানুষের মন ব'লে একটি বস্তু আছে এবং সে-মন সুখে উল্লসিত হয়, বেদনায় হয় কাতর। বৈষ্ণব কবিতায় এসে দেখা যায় মনের রাজত্ব, যেনো মন আর তার আকুলতা ছাড়া বিশ্বের সব কিছু মিথ্যে। বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কবিতায় ঘর সংসার সমাজ বিশ্ব সকল কিছুকে মিথ্যে ব'লে ঘোষণা করেছেন; একমাত্র সত্যি ব'লে দেখিয়েছেন হৃদয়কে। তাই বৈষ্ণব কবিতায় সর্বত্র দেখা যায় হৃদয়ের জয়। হৃদয়ই বৈষ্ণব পদাবলির বিশ্ব।

বৈষ্ণব কবিতার বিষয় রাধা ও কৃষ্ণের ভালোবাসা। এরা একজন চায় অপরজনকে, কিন্তু এদের মধ্যে বিপুল বাধা। এ-বাধাকে সরাতে চেয়েছেন কবিরা। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে মধ্যযুগের সব কবিতাই ধর্মের বাহন। বৈষ্ণব কবিতাও তাই। বৈষ্ণবরা মনে করে এই যে সৃষ্টি তার একজন স্রষ্টা আছে। এ-স্রষ্টা কিন্তু নির্দয় নয়, সে তার সৃষ্টিকে ভালোবাসে। সৃষ্টিও তার স্রষ্টাকে ভালোবাসে। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ে চায় মিলিত হতে, কিন্তু পারে না। যে-তত্ত্বের কথা বললাম, বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে সে-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। রাধা হচ্ছে সৃষ্টি বা বৈষ্ণবদের ভাষায় 'জীবাত্মা',

এবং কৃষ্ণ হচ্ছে স্রষ্টা বা বৈষ্ণবদের ভাষায় 'পরমাত্মা'। এ-জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনবিরহের কথা বলতে চেয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা। কিন্তু আমাদের ধর্মের বা তত্ত্বের দিকে বিশেষ আকর্ষণ নেই, আমরা প্রাণভরে চাই শুধু অসাধারণ এ-কবিতাগুলোকে। বৈষ্ণব কবিতা গীতিকবিতা। যেনো প্রাণের ভেতর থেকে আকুল হয়ে বেরিয়ে এসেছে সুরের মালা। বৈষ্ণব কবিতার কোনোটির বিষয় কৃষ্ণের রূপ, কোনোটির বিষয় রাধার রূপ, কোনোটির বিষয় দুজনের মিলন। এ-রকম অনেক বিষয়কে তাঁদের কবিতার মধ্যে ধ'রে রেখেছেন কবিরা। বিষয় অনুসারে এ-কবিতাগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলোর কোনোটির নাম অনুরাগ, কোনোটির নাম বংশী, কোনোটির নাম আক্ষেপ, আবার কোনোটির নাম বিরহ ইত্যাদি। এর ফলে সমস্ত বৈষ্ণব কবিতা মিলে গ'ড়ে উঠেছে এক চমৎকার গীতিনাট্য। অন্য এক রকমেও এ-কবিতাগুলোকে ভাগ করা যায়। সেটি হলো রসের ভাগ। মানুষের মনের যে-আবেগঅনুভূতি নিয়ে রচিত হয় সাহিত্য, তাকে প্রাচীনকালের সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা কতকগুলো 'রস'-এ ভাগ করেছেন। যেমন করুণরস, বীররস ইত্যাদি। বৈষ্ণবদের মতে রস পাঁচ প্রকার। তাঁরা পাঁচ রকমের রস পরিবেশন করেছেন কবিতায়। রসগুলো হচ্ছে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর।

বৈষ্ণব কবিরা যেমন সংখ্যাহীন, তেমনি অসংখ্য তাঁদের রচিত কবিতা। কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় ঠিক কতোগুলো বৈষ্ণব কবিতা আছে বাঙলা ভাষায়। মধ্যযুগে কবিতা রচিত হতো মুখেমুখে, গাওয়া হতো গানের আসরে। সাধারণত ওগুলো লিখে রাখা হতো না; মানুষ ওগুলোকে গেঁথে রাখতো নিজেদের স্মৃতিতে। কিন্তু স্মরণশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং যিনি মুখস্থ ক'রে রেখেছেন, তাঁর মৃত্যুর পরে ওগুলো হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এভাবে অনেক পদ হারিয়ে গেছে, আমাদের কাছে এসে পৌঁছোতে পারে নি। তাই মধ্যযুগেই শুরু হয়েছিলো এ-গানগুলোকে সংকলিত করার চেষ্টা। এর ফলে বেঁচে আছে গানগুলো। বৈষ্ণব কবিতা যিনি সবার আগে সংকলন করেন, তাঁর নাম বাবা আউল মনোহর দাস। হুগলি জেলার বদনগঞ্জে তাঁর সমাধি রয়েছে। তিনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বৈষ্ণব কবিতা সংকলন করেন। তাঁর এ-সংকলনগ্রন্থটি আকারেও বিশাল, এর নাম *পদসমুদ্র।* আসলেই এটি এক মহাসাগর, কবিতার মহাসমুদ্র। তিনি এ-গ্রন্থে সংগ্রহ করেন পনেরো হাজার বৈষ্ণব কবিতা। তাঁর পরে যিনি বৈষ্ণব কবিতা সংকলন করেন, তিনি রাধামোহন ঠাকুর। তাঁর বইয়ের নাম *পদামৃতসমুদ্র।* আঠারোশতকের প্রথম দিকে আরো একটি বৈষ্ণব কবিতাসংকলন প্রকাশ করেন বৈষ্ণব দাস। তাঁর বইয়ের নাম *পদকল্পতরু।* এর পরে আরো অনেক সংকলন হয়েছিলো, যেমন গৌরীমোহন দাস কবিতা সংকলন করেছিলেন *পদকল্পলতিকা* নামে, হরিবল্লভের সংকলনের নাম *গীতিচিন্তামণি,* প্রসাদ দাসের সংকলনের নাম *পদচিন্তামণিমালা।* এ-সব সংকলনে তিরিশ হাজারেরও অধিক কবিতা সংকলিত হয়েছিলো।

বৈষ্ণব কবিতা আকারে ছোটো; এ-কবিতায় জীবনের সমস্ত মোটা কথা পরিহার ক'রে ছেঁকে তোলা হয়েছে মনের আবেগের সারটুকু। তাই এখানে পাওয়া যায় মানুষের দুঃখের এবং আনন্দের সারসত্তা। রাধার আনন্দ, রাধার বেদনায় আমরা নিজেদের আনন্দবেদনাকে পাই। মধ্যযুগে এ-কাজটি করতে পেরেছিলেন বৈষ্ণব কবিরা। বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন অতিশয় সৌন্দর্যচেতন। সেকালে তাঁরা সৌন্দর্যের যে-সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর।

রাধা বা কৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনার কালে, বা তমালের একটি শাখা বর্ণনার কালে, অথবা যমুনার নীলজলের কথা বলার সময় তাঁরা পৃথিবীকে স্বপ্নলোকে পরিণত করেছেন। তাঁদের সাথে তুলনা করা যায় শুধু আর একজন কবিকে, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যদি মধ্যযুগে জন্ম নিতেন, তবে তিনি হতেন একজন বৈষ্ণব কবি।

অপূর্ব এ-সব কবিতার উপমা; অতুলনীয় এগুলোর ছবি। ভাষার ওপর তাঁদের অধিকার ছিলো বিধাতার মতো; তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বাঙলা ভাষার সে-সব শব্দ, যা মনোহর, মায়াবী, স্বপ্নের মতো। তাই বিদ্যাপতির কবিতা, চণ্ডীদাসের কবিতা আমাদের আকুল ক'রে তোলে। তাঁরা যখন উপমা দেন মনে হয় এ-রকম আর হয় না; তাঁরা যখন হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন তাতে আমরা আবেগাতুর হয়ে পড়ি। বিদ্যাপতি কবিতা রচনা করতেন ব্রজবুলি নামক এক ভাষায়। এটি বাঙলা ভাষা নয়, আবার একে অবাঙলাও বলা যায় না। এতে সামান্য কৃত্রিমতা আছে, তবে এতে আছে সুমধুর ধ্বনি, সুর; তাই এতে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। বিদ্যাপতির একটি পদ তুলে আনছি এখানে, যার ভাষা আর কল্পনার মধুরতায় বিভোর হ'তে হয় :

যব—গোধূলি সময় বেলি।
ধনি—মন্দির বাহির ভেলি ॥
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি ॥
ধনি—অল্প বয়েসী বালা।
জনু—গাঁথনি পুহপ-মালা ॥

ভাষাটি বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে হয়তো। কিন্তু একবার বুঝে ফেললে উল্লসিত হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এ-ভাষার যাদুতে এতো মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এ-ভাষা শিখে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। এ-ভাষার নামই ব্রজবুলি। এ-ভাষায় কোনো অমধুর শব্দ নেই। কঠিন শব্দ নেই। যে-সকল শব্দ উচ্চারণ করলে শুনতে ভালো লাগে না, তাদের বদলে এখানে সুন্দর করা হয়। এজন্যে ব্রজবুলি খুব মিষ্টি, সুরময়, গীতিময় ভাষা। ওপরের অংশে এজন্যে 'বেলা' হয়েছে 'বেলি', 'বিদ্যুৎ' হয়েছে 'বিজুরি', 'রেখা' হয়েছে 'রেহা'। কবি রাধার বর্ণনা দিচ্ছেন কবিতাটিতে। রাধা খুব রূপসী, তখন গোধূলি বেলা। কবি বলছেন, যখন গোধূলি বেলা, তখন রাধা ঘর থেকে বাইরে এলো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কবি রাধার বাইরে আসার দৃশ্যকে একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। বলছেন, হঠাৎ যেনো মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকে গেলো। তারপর বলছেন, রাধা অল্প বয়সের মেয়ে। কিন্তু কেমন মেয়ে ? যেনো ফুলের গাঁথা মালা।

সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব কবিতায় যেমন শিউলি ভোরের বেলা ছড়িয়ে থাকে শিউলি বনের অঙ্গনে। এ-কবিতায় ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্যে বিশ্ব ভেসে যায়। কৃষ্ণ এখানে সৌন্দর্য ছড়ায়, রাধা এ-কবিতায় সৌন্দর্যের দেবী হয়ে আসে। চারদিকে ভাসে রাধার মনের আকুল কান্নার মধুর ধ্বনি। বৈষ্ণব কবিতার রাজ্যে সারাক্ষণ বাঁশি বেজে যাচ্ছে, সে-বাঁশিতে পাগল হয় রাধা, পাগল হই আমরা, সবাই। এমনকি নাম শুনেও রাধা আকুল হয়ে ওঠে কৃষ্ণের জন্যে। চণ্ডীদাসের একটি পদে রয়েছে :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমন পাইব সই তারে ॥

এ-পদটি সহজ সরল, কিন্তু এর আবেগ তীব্র বাঁশরির সুরের মতো। রাধা শুধু শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম শুনেছে, তাতেই সে আকুল হয়ে উঠেছে। কবি তার হৃদয়ের আকুলতাকে ছন্দে গেঁথে দিলেন, আর যুগযুগ ধ'রে সে-ছন্দের ঢেউ রাধার আকুলতা হয়ে আমাদের বুকে এসে দোলা দিতে লাগলো।

বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস। তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস লিখেছেন ব্রজবুলি ভাষায়, আর চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস লিখেছেন খাঁটি বাঙলা ভাষায়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বেশি সাজানোগোছানো, তাঁরা আবেগকে চমৎকাররূপে সাজাতে ভালোবাসেন। ভেবেচিন্তে, চমৎকার উপমাউৎপ্রেক্ষায় গেঁথে এ-দুজন কবিতা লিখেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস সহজ সরল আবেগ প্রকাশ করেন সহজ সরল ভাষায়; কিন্তু ভাষার মধ্যে সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন নিজেদের প্রাকৃত হৃদয়ের তীব্র চাপ। এ-দুজনের কবিতা যেনো বনফুল; আর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিতা বাগানের লালিত পুষ্প। জ্ঞানদাসের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি তুলে আনছি :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

গোবিন্দদাসও মহান কবি, তাঁর কল্পনা মোহকর। তিনি কল্পনাকে চমৎকার অলঙ্কার পরিয়ে দেন। তাঁর কয়েকটি পংক্তি :

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণচরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই ॥

গোবিন্দদাসের ভাষাটি একটু কঠিন, কিন্তু এর ভেতরে আছে সৌন্দর্য। কবি এখানে রাধার বর্ণনা দিচ্ছেন। রাধা খুব সুন্দর, তা সবাই জানি; কবি সে-সৌন্দর্য কী রকম, তা বলছেন। রাধা তার সখীদের সাথে যাচ্ছে। কবি বলছেন, রাধার শরীর থেকে যেখানে ছলকে পড়ছে সৌন্দর্য, সেখানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেখানে রাধা রাখছে তার আলতারাঙানো পা, সেখানেই যেনো রাধার পা থেকে ঝ'রে পড়ছে স্থলপদ্মের লাল পাপড়ি। এমন অনেক সুন্দর বর্ণনা আছে বৈষ্ণব কবিতায়। বৈষ্ণব কবিতা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার মহাকবি। রাজার নাম শিবসিংহ, রাজার রাজধানীর নাম মিথিলা। বিদ্যাপতি বাঙলা ভাষায় একটিও কবিতা লিখেন নি, তবুও তিনি বাঙলা ভাষার কবি। বিদ্যাপতি লিখতেন ব্রজবুলি নামক একটি বানানো ভাষায়। এ-ভাষাটিতে আছে হিন্দি শব্দ, আছে বাঙলা শব্দ এবং আছে প্রাকৃত শব্দ। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ মিলে অবাক-করা এক মধুর ভাষা ব্রজবুলি। এ-ভাষাতে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন কবি বিদ্যাপতি। কবি বিদ্যাপতি বেঁচে ছিলেন পঞ্চদশ শতকে। তখন মিথিলা ছিলো জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র। সেকালের বাঙলার ছেলেরা জ্ঞানার্জনের জন্যে যেতো মিথিলায়, আর বুক ভ'রে নিয়ে আসতো বিদ্যাপতির মধুর কবিতাবলি। এভাবে বিদ্যাপতির কবিতা হয়েছে বাঙলা কবিতা এবং বিদ্যাপতি হয়েছেন বাঙলার কবি। বিদ্যাপতিকে ছাড়া বৈষ্ণব কবিতার কথা ভাবাই যায় না। বিদ্যাপতি শুধু ছোটোছোটো বৈষ্ণব কবিতার মালা রচনা করেন নি, তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ আছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন *পুরুষপরীক্ষা* নামে একটি বই। বিদ্যাপতির এ-জাতীয় আরো কয়েকটি বই : *কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার।* কবির রচনায় মোহিত হয়েছিলো তাঁর রাজা শিবসিংহ। এজন্যে সে বিদ্যাপতিকে একটি চমৎকার উপাধিতে ভূষিত করে। উপাধিটি হলো 'কবিকণ্ঠহার'।

বিদ্যাপতি আমাদের প্রিয় তাঁর অতুলনীয় বৈষ্ণব কবিতাগুলোর জন্যে। এ-কবিতাগুলোর ভাব-ভাষা-প্রকাশরীতি মোহনীয়। কবি বিদ্যাপতি আবেগে ভেসে যেতেন না চণ্ডীদাসের মতো, তিনি তাঁর ভাবকে পরিয়ে দিতেন সুন্দর ভাষা এবং ভাষাকে সাজিয়ে দিতেন শোভন অলঙ্কারে। উপমা-রূপক তিনি ব্যবহার করেন কথায় কথায়, তাঁর উপমা-রূপক ঝাড়লণ্ঠনের মতো আলো দেয় কবিতা ভ'রে। আধুনিক কালে এক কবি বলেছেন, উপমাই কবিত্ব। অনেকে বলেন, রূপকই কবিত্ব। এ-কথার সত্যতা আমরা বুঝতে পারি বিদ্যাপতির কবিতা পড়লে। বিদ্যাপতির একটি ছোটো কবিতা উদ্ধৃত করছি। কবিতাটিতে রাধা বলছে কৃষ্ণ তার কে হয়। একথা বোঝাতে রাধা অবিরাম সাহায্য নিচ্ছে রূপকের। একটি রূপকের পর ব্যবহার করছে আরেকটি রূপক, এবং পরে আরেকটি, এবং আরো আরো। পদটি হয়ে উঠেছে রূপকের দীপাবলি। কবিতাটি :

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি ॥
তুহু কৈসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুঁহু দোঁহা হোয় ॥

কবিতাটিতে রাধা ভালোভাবে জানতে চাইছে কৃষ্ণ তার কে হয় ? তখন রাধা বসে কাব্যিক হিশেবনিকেশে। রাধার মনে হয় কৃষ্ণ তার হাতের আয়না, যাতে সে নিজেকে দেখে থাকে। তারপর মনে হয় কৃষ্ণ তার মাথার ফুল, যা তার শোভা বাড়িয়ে দেয়।

তারপর বলতে থাকে এভাবে—তুমি আমার চোখের কাজল, মুখের লাল পান। তুমি আমার হৃদয়ের সৌরভ, গ্রীবার অলঙ্কার। তুমি আমার শরীরের সর্বস্ব, আমার গৃহের সার। পাখির যেমন থাকে পাখা এবং মাছের যেমন জল, তুমি ঠিক তেমনি আমার। রাধা বলছে, প্রাণীরা যেমন জানে নিজেদের প্রাণকে তুমি ঠিক তেমনি আমার। এতো ব'লেও তৃপ্তি হয় না রাধার, কেননা এখনো সে বুঝতে পারে নি পরম পুরুষ কৃষ্ণ তার কে হয়। তাই শেষ চরণের আগের চরণে কৃষ্ণকেই জিজ্ঞেস করে, বলো প্রভু তুমি আমার কে ? উত্তরটি দেন কবি বিদ্যাপতি নিজে। কবি বলেন, তোমরা দুজনে অভিন্ন। চমৎকার নয়? বিদ্যাপতির কল্পনা অসাধারণ ভাষা লাভ করেছে। এ-রকম ভালো তাঁর সব কবিতাই, পড়তে পড়তে মন ভ'রে যায়।

আরেকটি আনন্দের অসাধারণ কবিতার কথা বলি। কবিতাটির বিষয় হলো বহুদিন পর, বহু নিশীথের পর কৃষ্ণ ফিরে এসেছে রাধার কাছে। রাধার আনন্দ আর ধরে না, কেননা এতোদিনে তার বেদনার দিন ফুরোলো। কৃষ্ণ কাছে ছিলো না ব'লে আগে রাধার চাঁদের আলো ভালো লাগে নি, চন্দনের শীতল ছোঁয়াকে মনে হয়েছে বিষের মতো। কৃষ্ণ এসেছে, রাধার মন আনন্দে তাই নাচছে রঙিন ময়ূরের মতো। তাই রাধা বলছে :

আজু রজনী হম ভাগে গমাওল
পেখল পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানল
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।...
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ॥

অর্থাৎ অনেক ভাগ্যে আজ আমার রাত পোহালো; দেখলাম প্রিয়মুখ। আমার জীবন আজ সফল, দশদিক এখন আনন্দময়। আজ আমার গৃহ হলো গৃহ, দেহ হলো দেহ। এখন কোকিল ডাকুক লাখে লাখে, লাখে লাখে উদয় হোক চাঁদ।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস বাঙলা কবিতার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর হৃদয় ভরা ছিলো অসাধারণ আবেগে, এতো আবেগ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবির নেই। তাঁর কবিতা পড়ার অর্থ হলো আবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া। তবে এ-আবেগ বানানো নয়, ফিকে নয়; টসটসে তাঁর আবেগ। তিনি আবেগকে ঠিক ভাষায় সাজিয়ে দিতে পেরেছেন। এ-মহাকবিকে নিয়ে এক বড়ো সমস্যা আছে বাঙলা সাহিত্যে। সমস্যাটি বিখ্যাত 'চণ্ডীদাস-সমস্যা' নামে। আমরা চণ্ডীদাস নামের বেশ কয়েকজন কবির কবিতা পেয়েছি। তাঁদের কারো নাম বড়ু

চণ্ডীদাস, কারো নাম দ্বিজ চণ্ডীদাস, কারো নাম দীন চণ্ডীদাস। এজন্যে প্রশ্ন উঠেছে কজন চণ্ডীদাস ছিলেন আমাদের ? এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আজকাল মনে করা হয় তিনজন চণ্ডীদাস আছেন আমাদের : একজনের নাম বড়ু চণ্ডীদাস, আরেকজনের নাম দীন চণ্ডীদাস, এবং অন্যজনের নাম দ্বিজ চণ্ডীদাস। এখানে দ্বিজ চণ্ডীদাসের কথা বলছি।

বড়ু চণ্ডীদাস আমাদের প্রথম মহাকবি। তাঁর একটি কাব্য পাওয়া গেছে; নাম *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।* এটি এক দীর্ঘ কাব্য, অনেকগুলো পদ বা কবিতার সমষ্টি। বড়ু চণ্ডীদাস কাহিনী বলার ও আবেগ প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর কবিতা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥...
অঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন চতুর্দশ শতকের শেষভাগে, বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে। তিনি ছিলেন বাশুলীদেবীর ভক্ত। তাঁর সম্বন্ধে অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। এ-উপকথাগুলোর মধ্যে সত্য কতোটুকু আছে তা আজ আর যাচাই ক'রে দেখা সম্ভব নয়, তবে এসব থেকে বুঝতে পারি কবি হিশেবে তিনি লাভ করেছিলেন অসীম জনপ্রিয়তা। তাঁর সহজ সরল কথার তীব্র আবেগ বাঙলাদেশকে আকুল ক'রে তুলেছিলো। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব পাগলের মতো জপ করতেন চণ্ডীদাসের পদাবলি।

চণ্ডীদাসের জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর রাধা। রাধার আবেগ, আচরণ, সকাতর হৃদয় এতো মোহনীয় যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। রাধা মানবীরূপে মানুষের হৃদয়ের আবেগ। মানুষের হৃদয়ের আকুলতা তার মধ্যে রূপ লাভ করছে। রাধার সব আবেগ ও কাতরতা কৃষ্ণের জন্যে। কৃষ্ণের নাম শুনেই রাধা কৃষ্ণের জন্যে অধীর হয়, সব সময় সে কৃষ্ণের কথা ভাবে, সব কিছুতে সে দেখতে পায় সুন্দর কৃষ্ণকে। আকাশের মেঘ, যমুনার নীল জল, ময়ূরের কণ্ঠের উজ্জ্বল রঙে রাধা খুঁজে পায় শ্যাম বা কৃষ্ণকে। চণ্ডীদাস জটিল নন, অনেক ভেবে তিনি কবিতা রচনা করেন না। অতি সহজে এতো গভীর কথা তিনি বলেন যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। চণ্ডীদাসের একটি সকাতর পদের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

বহু দিন পরে বধুঁয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এই সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

চণ্ডীদাসের কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত কোমল আবেগের প্রকাশ, গীতিময় ও অন্তরঙ্গ। অনেকটা দীর্ঘশ্বাসের মতো। চণ্ডীদাসের ভাষাও সহজ সরল, তাঁর আবেগের মতো নিরাভরণ। তাঁর পদ অরণ্যের নির্জন পুষ্পের মতো চিরস্নিগ্ধ, গোপন সুবাস বিলিয়ে চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

চৈতন্য ও বৈষ্ণবজীবনী

চৈতন্যদেব এক অক্ষরও কবিতা লেখেন নি, তবু তিনি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিকার ক'রে আছেন বড়ো স্থান। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অসীম। তিনি মধ্যযুগের বাঙলাদেশে জাগিয়েছিলেন বিশাল আলোড়ন, তাতে অনেকখানি বদলে গিয়েছিলো বাঙলার সমাজ ও চিন্তা ও আবেগ। তিনি সাহিত্যে যে-আলোড়ন জাগান, তা তো তুলনাহীন। মধ্যযুগের সমাজ ছিলো সংস্কারের নিষ্ঠুর দেয়ালে আবদ্ধ, চৈতন্যদেব তার মধ্যে আনেন আকাশের মুক্ত বাতাস। তিনি প্রচার করেন ভালোবাসার ধর্ম, যাকে বলা হয় বৈষ্ণব ধর্ম। এর ফলে মধ্যযুগের মানুষ লাভ করে কিছুটা মানুষের মর্যাদা, এবং মধ্যযুগের কবি বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙলার জীবনে, সমাজে এসেছিলো জাগরণ। এর ফলেই বাঙলা সাহিত্য ফুলেফুলে ভ'রে ওঠে।

চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার। তাঁর সম্পর্কে গভীর আবেগে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করেছিলো, তা বাঙলাদেশে। তাঁর কথায় যেমন আছে আবেগ, তেমনি রয়েছে সত্য। চৈতন্যদেব জন্মেছিলেন ১৪৮৬ অব্দে নবদ্বীপে। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র; মায়ের নাম শচীদেবী। ভালোবেসে চৈতন্যদেবকে মানুষ নানা নামে ডাকে। তাঁর আসল নাম ছিলো বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। তাঁর গায়ের রঙ ছিলো গৌরবর্ণ, তাই তাঁর আরেক নাম গৌরাঙ্গ, সংক্ষেপে গোরা। বাল্যে চৈতন্য ছিলেন যেমন দুষ্ট, তেমনি মেধাবী। বেশ ভালোভাবে পড়াশুনা ক'রে যৌবনেই চৈতন্য পণ্ডিত হিশেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ছাত্রদের পড়ানোর জন্যে একটি ইস্কুল খোলেন তিনি। কিন্তু বেশিদিন তা চলে নি। একবার গয়া যান চৈতন্য। সেখানে দেখা পান ঈশ্বরপুরীর এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর কাছে। এরপরে গোরা হয়ে ওঠেন শ্রীচৈতন্য। তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন ভগবত প্রেমে, মেতে ওঠেন হরিসংকীর্তন এবং ভগবতপাঠে। এরপর সারাজীবন কেটেছে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে। তিনি প্রচার করেছেন প্রেম। তাঁর অপূর্ব ধর্মে ধীরেধীরে এসে যোগ দিয়েছে প্রেমপাগল মানুষেরা। চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমকে জীবনের সারকথা বলে মেনে নিয়েছিলেন। সেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই, সবাই সমান। এ যে কতো বড়ো ঘোষণা, তা মধ্যযুগের পটভূমি ছাড়া বোঝা কঠিন। তখন মানুষে মানুষে ছিলো সীমাহীন প্রভেদ, এমনকি ধর্মেও সকলের অধিকার ছিলো না। এ-সময়েই শ্রীচৈতন্য বলেন, 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।' এ-ঘোষণা মানুষকে বিরাট মূল্য দেয়। চৈতন্যদেব বেশিদিন বাঁচেন নি; মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ সালে তিনি পুরীতে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। কেউ বলেন, তিনি পুরীতে কৃষ্ণপ্রেমে এতো পাগল ছিলেন যে সমুদ্রের নীল জলকে তাঁর মনে হয়েছিলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মনে ক'রে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করেন। আবার কেউ বলেন, রথযাত্রার সময়ে তিনি নামকীর্তন ক'রে নাচছিলেন, তখন তাঁর গায়ে আঘাত লাগে। তাতেই তিনি মারা যান।

বাঙলার জীবনে যেমন বাঙলা সাহিত্যেও তেমনি চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। অনেকটা তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত হয়েছে মধ্যযুগের গৌরব বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য। এ-সাহিত্যে আছে পদাবলি, আছে দর্শন, আছে জীবনীসাহিত্য। পদাবলির কথা আগেই বলেছি। বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্যও মধ্যযুগের মূল্যবান সৃষ্টি, কেননা যে-মধ্যযুগ কেটেছে দেবতাদের গুণগানে, সেখানে বৈষ্ণবেরা বসিয়েছিলেন মানুষকে। দেবতার বদলে মানুষের প্রাধান্য বৈষ্ণব জীবনসাহিত্যের বড়ো বৈশিষ্ট্য।

আজকাল যেভাবে জীবনী রচিত হয়, বৈষ্ণবজীবনী তেমনভাবে রচিত হয় নি। এখন আমরা মানুষকে মানুষ হিশেবেই দেখতে ভালোবাসি, মানুষকে দেবতা ক'রে তুলি না। মধ্যযুগে এটা সম্ভব ছিলো না। এ-জীবনীগুলো যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ভক্ত। চৈতন্যদেবের ভক্তের চোখে চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষ নন, তিনি অবতার। তাই এ-জীবনীসমূহে মানুষ অনেক সময় দেবতা হয়ে উঠেছেন। এখানে অবলীলায় স্থান পেয়েছে অলৌকিক ঘটনা, যেগুলোকে তাঁরা সত্যি ব'লে ভাবতেন। আজকের চোখে নিছক কল্পনা, কিন্তু সেকালে তাঁরা এগুলোকে অবিশ্বাস্য ব'লে অবহেলা করতে পারেন নি। তবু এ-জীবনীগুলো বড়ো মূল্যবান। জীবনীগুলোতে সেকালের পরিচয় আছে, আছে সে-সময়ের সমাজের চিত্র। আর যাঁর জীবনকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকেও আমরা অনেক সময় পাই মানুষ হিশেবে।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অল্প পরে তাঁর দুটি জীবনীগ্রন্থ লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়। বাঙলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যদেবের যে-জীবনী লেখা হয়, তার নাম *চৈতন্যভাগবত।* যিনি লেখেন, তাঁর নাম বৃন্দাবন দাস [? ১৫০৭—১৫৮৯]। এটি লেখা হয়েছিলো চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পনেরো বছরের মধ্যে। বৃন্দাবন দাসকে এ-গ্রন্থ লেখার প্রেরণা দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। এ-গ্রন্থের ঘটনাগুলো তিনি শুনেছিলেন চৈতন্যের সহচরদের মুখে, আর তাকেই তিনি কাব্যরূপ দান করেন। এর মধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনাও আছে। এ-বইটি বিশাল।

বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত-এর* পরে চৈতন্যদেবের আরো একটি জীবনী রচনা করেন লোচন দাস [১৬শ শতকে]। এ-বইয়ের নাম *চৈতন্যমঙ্গল।* এটি *চৈতন্যভাগবত-এর* চেয়ে ছোটো বই। চৈতন্যদেবের জীবনী হিশেবে যে-বই সবচেয়ে বিখ্যাত, তার নাম *চৈতন্যচরিতামৃত।* এ-বইয়ের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৫৩০—১৬১৫]। এ-বইটিতে চৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনার সাথে সাথে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর দর্শন। কাব্য হিশেবেও এটি চমৎকার। নানা যুক্তির সাহায্যে কৃষ্ণদাস এ-বইতে বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যা ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর বর্ণনা সহজ সরল, তবে মাঝেমাঝে কবি চমৎকার উপমারূপক ব্যবহার করেছেন কঠিন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্যে। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি বলেন :

মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ॥

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন ভক্ত। বর্ধমানে কাটোয়ার কাছে ঝামটপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাব্যে নিজের সম্বন্ধে যে-বিনীত ভাষণ করেছেন, তা শোনার মতো:

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণার পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥
তৈছে এক কণা আমি ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥
আমি লিখি এহ মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতুলী সমান ॥

এর পরে জয়ানন্দ [জন্ম ? ১৫১২] রচনা করেন *চৈতন্যমঙ্গল।* চৈতন্যদেবের জীবনী ছাড়া বৈষ্ণব ধর্মের আর যাঁরা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের জীবন নিয়েও বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য ছিলেন এমন এক ব্যক্তি। কৃষ্ণদাস তাঁর বাল্যকালের কথা লেখেন সংস্কৃত ভাষায়, বইটির নাম *বাল্যলীলাসূত্র।* পরে শ্যামানন্দ বইটি বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন *অদ্বৈততত্ত্ব* নামে। তাঁর সম্বন্ধে লেখা আরেকটি বইয়ের নাম *অদ্বৈতপ্রকাশ।* কেবল অদ্বৈতকে নিয়েই জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় নি, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়েও জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে। সীতা দেবীর একটি জীবনী রচনা করেছেন বিষ্ণুদাস আচার্য, নাম "সীতাগুণকদম্ব"। আরেকটি জীবনী রচনা করেন লোকনাথ দাস, নাম *সীতাচরিত।*

এ-সমস্ত বই রচিত হয়েছিলো ষোড়শ শতকে। সপ্তদশ শতকে জীবনীর বিষয়বস্তু অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। এতোদিন যে-সকল জীবনী রচিত হয়, সেগুলো প্রধানত চৈতন্যদেব ও অদ্বৈত আচার্যের এবং তাঁর স্ত্রীর জীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যের নায়ক হয়ে ওঠেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। এসব গ্রন্থের একটি হচ্ছে নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস।* গুরুচরণ দাস রচনা করেন নিবাস ও তাঁর পুত্রের বাল্যজীবনী, নাম *প্রেমামৃত।* বৈষ্ণব জীবনীগুলোর মূল্য অশেষ।

দেবতার মতো দুজন এবং কয়েকজন অনুবাদক

কোনো ভাষা শুধু মৌলিক সাহিত্যে সমৃদ্ধ হ'তে পারে না। যে-ভাষা যতো ধনী, তার অনুবাদ সাহিত্যও ততো ধনী। আমাদের ভাষায় যা নেই, তা হয়তো আছে জর্মন ভাষায় বা ফরাশি ভাষায়। তাই আমাদের ভাষাকে আরো ঋদ্ধ করার জন্যে আমরা অপর ভাষা থেকে

অনুবাদ করি। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, তাঁরা অনুবাদের আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছিলেন। হিন্দু কবিরা সাধারণত অনুবাদ করেছেন তাঁদের পুরাণ কাহিনীগুলো; মুসলমান কবিরা অনুবাদ করেছেন ফারসি, হিন্দি থেকে রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। এখানে হিন্দু কবিদের কথা বলবো। তাঁরা পুরাণ কাহিনী অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ করেছেন *রামায়ণ* ও *মহাভারত*। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করা সহজ কথা ছিলো না। সমাজের ধর্মের যাঁরা ছিলেন মাথা, তাঁরা বাঙলা ভাষায় এসব গ্রন্থের অনুবাদের ভীষণ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন সংস্কৃত থেকে ওসব পুণ্যগ্রন্থ যদি অনূদিত হয় বাঙলায়, তবে ধর্মের মর্যাদাহানি হবে। এ-রকম কিন্তু হয়েছে সব দেশেই। ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন অনুবাদকেরা। জর্মন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন মার্টিন লুথার। তাঁকেও অনেক বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিলো। বাঙলা ভাষায় কোরান অনুবাদ করতে গিয়েও কম বাধা আসে নি। তাই মধ্যযুগে কবিরা যখন বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ করতে যান, তখন তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় অনেক বাধা। কবিরা সে-সব বাধা অবহেলা করেছেন। কবিদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তখনকার মুসলমান সম্রাটরা। মুসলমান সম্রাটদের উৎসাহে বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত অনূদিত হ'তে পেরেছিলো। অনুবাদ সাধারণত করেছেন হিন্দু কবিরা। এ-অনুবাদ কাজে তাঁরা মুসলমান সম্রাটদের সহায়তা পেয়েছেন ব'লে তাঁরা সম্রাটদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রামায়ণ-মহাভারত শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়। এ-দুটি বইয়ে রয়েছে নানা মনোহর কাহিনী। কাহিনীর মনোহারিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন মুসলমান রাজারা, আর বারবার তাঁরা কবিদের উৎসাহ দিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ করতে। রামায়ণ ও মহাভারতের দুজন অনুবাদক আজ প্রায় দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন রামায়ণের অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস এবং মহাভারতের অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস। এ-দুজন ছাড়াও আছেন আরো অনেক অনুবাদক, যাঁরা রামায়ণ-মহাভারত কবিতায় অনুবাদ করেছেন। তাঁদের সকলের রচনা আজ আর পড়া হয় না, কিন্তু প্রবল ভক্তিতে বাঙলার হিন্দুরা পড়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত। মধ্যযুগের কোনো অনুবাদই মূল রচনার হুবহু অনুবাদ নয়। কবিরা মূল কাহিনী ঠিক রেখে মাঝেমাঝে নিজেদের মনের কথাও বসিয়ে দিয়েছেন এখানেসেখানে। তাতে এগুলো অনুবাদ হয়েও নতুন রচনা হয়ে উঠেছে। তাই আজ আর বলি না যে কাশীরাম অনুবাদ করেছেন মহাভারত, কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছেন রামায়ণ। বলি, বাঙলায় মহাভারত লিখেছেন কাশীরাম দাস এবং রামায়ণ রচনা করেছেন কৃত্তিবাস। বাঙলায় তাঁরা দুজন বাল্মীকি এবং বেদব্যাসের সমান।

মুসলমান রাজারা রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণকাহিনী অনুবাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন কবিদের। তেমন কয়েকজন রাজার নাম বলছি। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের রাজা ছিলেন নাসির খাঁ। তাঁর অনুপ্রেরণায় মহাভারতের একটি অনুবাদ হয়েছিলো। অবশ্য এ-বইটি পাওয়া যায় নি। কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছেন রামায়ণ। কৃত্তিবাসকে প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ [১৪৫৯—৭৪]। পরাগল খান কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক এক কবিকে দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের অনেকখানি। পরাগল খানের পুত্রের নাম ছিলো ছুটি খান। ছুটি খানের উৎসাহে শ্রীকর নন্দী নামক আরেকজন

কবি অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের আরো অনেকখানি। এভাবে আরো অনেক মুসলমান রাজার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা উৎসাহ দিয়েছিলেন এ-সব গ্রন্থ অনুবাদে। মুসলমান রাজারা রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছিলেন নানা কারণে। তাঁরা গল্প শুনতে চেয়েছিলেন ব'লে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দু প্রজাদের বশীভূত করতে চেয়েছিলেন ব'লে অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

রামায়ণের প্রথম অনুবাদকই শ্রেষ্ঠ অনুবাদক; তাঁর নাম কৃত্তিবাস। মহাভারতের বেলা ঘটেছে অন্যরকম। কাশীরাম দাস মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক, তবে তিনি প্রথম অনুবাদক নন, বেশ পরবর্তী অনুবাদক। আমরা এখানে কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস সম্বন্ধেই বেশি কথা বলবো। তার আগে অন্যান্য অনুবাদকের কথা কিছুটা ব'লে নিই। কৃত্তিবাস ছাড়া আর যাঁরা রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন, তাঁদের একজন চন্দ্রাবতী [জন্ম ১৫৫০]। চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা। রামায়ণের আরো কয়েকজন অনুবাদকের নাম : ভবানীদাস, জগৎরাম রায়, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ ঘোষ, দ্বিজ মধুকণ্ঠ, কবিচন্দ্র। মহাভারতের অনুবাদও করেছেন অনেক কবি। মহাভারতের প্রথম অনুবাদক শ্রীকর নন্দী। তিনি হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের অনুপ্রেরণায় সর্বপ্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন। মহাভারতের আরো কয়েকজন অনুবাদকের নাম : নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, রাজীব সেন, সঞ্জয়, রামনারায়ণ দত্ত, রাজেন্দ্র দাস। হিন্দুধর্মের একটি পবিত্র বই অনুবাদ করেছিলেন মালাধর বসু। বইটি *ভাগবত*। মালাধর বসুও একজন মুসলমান রাজার প্রেরণায় ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন। সে-রাজা তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মালাধর বসু লিখেছেন, 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।' মালাধর বসুর ভাগবতের অন্য নাম *শ্রীকৃষ্ণবিজয়।*

বাঙলা রামায়ণ মানেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এ-বই কয়েক শো বছর ধ'রে বাঙলার হিন্দুদের ঘরেঘরে পরম ভক্তিতে পঠিত হচ্ছে। রামসীতার বেদনার কথা কৃত্তিবাস পয়ারের চোদ্দ অক্ষরের মালায় গেঁথে বাঙালির কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন। রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে বাঙলার সম্পদে পরিণত হয়েছে, বাল্মীকির অসীম বৃহৎ জগৎ বাঙলাদেশে পরিণত হয়েছে। রামসীতা এবং আর সবাই হয়ে পড়েছে কোমল কাতর বাঙালি। যে-কৃত্তিবাস এমন অসাধারণ কাজ ক'রে গেছেন, তাঁকে নিয়ে কিন্তু সমস্যার অন্ত নেই। কৃত্তিবাস কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোন রাজার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, এ নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ বড়ো এক বিতর্ক রয়েছে। আজ মনে করা হয় কবি কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচিতিতে যে-রাজার ইঙ্গিত করেছেন, তার নাম রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের কবি। তাঁর একটি দীর্ঘ আত্মপরিচিতি পাওয়া গেছে। এ-আত্মপরিচিতিতে তিনি অনেক কথা বলেছেন; বেলা ক-টার সময় তিনি রাজার দরবারে গেলেন, তখন রাজা কী করছিলেন, তাঁর চারপাশে কারা ছিলেন, এসব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কবি শুধু রাজার নামটি বলতে ভুলে গেছেন! এমন হয়েছে তাঁর জন্মকালের বিবরণ দিতে গিয়েও। কখন তাঁর জন্ম হলো, কারা তাঁর পূর্বপুরুষ, তাঁর জন্মের সময় কোন তিথি ছিলো, তিনি সব বলেছেন। শুধু ভুলে গেছেন তাঁর জন্মের অব্দ বা সালটি উল্লেখ করতে! তাই কৃত্তিবাসকে নিয়ে মহাবিতর্ক, তিনি যেমন মহাকবি, তাঁকে নিয়ে বিতর্কটিও মহাকাব্যিক!

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচিতিটি চমৎকার। এটি পড়লে বোঝা যায় কবি কী রকম ছিলেন। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ছিলো বড়ো বিশ্বাস; তিনি যে বড়ো কবি সে-সম্পর্কে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহ ছিলো না। উনিশশতকের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত্তিবাসকে উদ্দেশ ক'রে বলেছেন, 'কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি।' রাজদরবারে যাওয়া সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥...
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুশি হৈয়া রাজা দিলা পুষ্পমাল॥...
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥...
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি ॥
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥

কবির স্নিগ্ধ মহান অহমিকার এমন প্রকাশ খুবই দুর্লভ। রাজা তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়েছেন; রাজার পাত্রমিত্ররা কবিকে বলেছেন, তোমার যা ইচ্ছে তা তুমি চাইতে পারো রাজার কাছে। কিন্তু কবি কৃত্তিবাস কিছুই চান না, কবিতাই তাঁর গৌরব; তাই বললেন, 'কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার।' কবির মহান ঔদ্ধত্যের প্রকাশরূপে পংক্তি দুটি অমর হয়ে আছে। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচিতিটির এ-অংশ পড়লে বাঙলা ভাষার অন্য একটি সেরা কবিতার কথা মনে পড়ে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার'। 'পুরস্কার' কবিতাটি পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার নায়ক কৃত্তিবাস বা অন্যকালের কৃত্তিবাস রোম্যানটিক রবীন্দ্রনাথ।

'পুরস্কার' কবিতার নায়ক কবি। তিনি বাড়িতে ব'সে ব'সে শুধু কবিতা রচনা করেন। তাঁর হাঁড়িতে চাল নেই, মাথার ওপর ঘরের চাল পড়োপড়ো। কবির সে-দিকে দৃষ্টি নেই, তিনি মেতে আছেন কাব্যলক্ষ্মীকে নিয়ে। তাঁর কবিতা অসাধারণ, কিন্তু সেগুলোকে তিনি অর্থ উপার্জনের পণ্য হিশেবে ব্যবহার করেন না। একদিন কবির স্ত্রী অনেক বুঝিয়ে কবিকে

রাজি করালেন রাজদরবারে যেতে। রাজা যদি খুশি হয় কবিতা শুনে, তবে আর কোনো অভাব থাকবে না সংসারে। রাজার কাছ থেকে অনেক ধন চেয়ে আনতে পারবেন কবি। স্ত্রীর কথায় কবিতা নিয়ে যান রাজদরবারে। রাজা কবিকে কবিতা শোনাতে বলে। কবি শোনান কালজয়ী অমর কবিতা। ওই কবিতার কয়েক স্তবক :

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।...
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু'একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।

আরো অনেক স্তবক শোনান কবি, রাজা হয় আনন্দে আত্মহারা। রাজা কবিকে কী দান করবে ভেবে পায় না। কবিকে রাজা বলেন, আমার ভাণ্ডারে যা আছে তা থেকে যা ইচ্ছে তুমি নিতে পারো, কবি। কবি কিন্তু কোনো ধন চাইলেন না, তিনি শুধু চাইলেন রাজার কণ্ঠের ফুলমালাখানি।

কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামের এক বিখ্যাত পণ্ডিত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম বনমালী। তিনি পদ্মা পেরিয়ে উত্তরে বরেন্দ্র অঞ্চলে গিয়েছিলেন বিদ্যালাভের জন্যে। সেখানে প্রচুর পড়াশুনো করার পর কৃত্তিবাস যান গৌড়ের রাজার কাছে। এ-রাজা রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। তারপরে লিখেন রামায়ণ। বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি অপূর্বরূপে বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তাঁর রামায়ণের অন্য নাম হলো *শ্রীরামপাঞ্চালি।* বর্তমানে যে-কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* প্রচলিত আছে, তাতে কৃত্তিবাসের রচনার আদিরূপ পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পর কয়েক শো বছর অতীত হয়েছে, কৃত্তিবাসের জনপ্রিয় কাব্যে কালেকালে নতুন কবিরা নিজেদের রচনা গেঁথে দিয়েছেন। তাছাড়া সেকালে কবিতা লিখিত হতো খুব কম, সাধারণত গায়কেরা নিজেদের মুখেমুখে বাঁচিয়ে রাখতেন কবিতা। এভাবে এক গায়কের কণ্ঠ থেকে কবিতা চ'লে যেতো অন্য গায়কের কণ্ঠে, তাতে অনেক পংক্তি পরিবর্তিত হতো, কখনো কোনো অংশ হয়তো বাদ পড়তো, আবার নতুন কোনো অংশ তৈরি ক'রে নিতেন গায়কেরা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছিলো। বাঙালি হিন্দুরা রামসীতার পুণ্যকাহিনী পড়ার জন্যে পাঁচশো বছর ধ'রে আর বাল্মীকির রামায়ণ খুলে ধরে না, তারা খুলে ধরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ১৮০২ কিংবা ১৮০৩ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। এটি ছেপেছিলেন শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় পাদ্রিরা। এরপর ১৮৩০ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের

ভাষা বেশ মেজেঘ'ষে নতুন ক'রে *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* মুদ্রিত করেন। এখন এ-বইটিই চলছে, এটিকেই অকৃত্রিম *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* মনে ক'রে ভক্তিতে আকুল মনে পাঠ করছে ভক্তরা।

কৃত্তিবাসের হাতে রাজপুত্র রাম, রাজবধূ সীতার অনেক বদল ঘটেছে। বদলে গেছে লক্ষ্মণ, রাবণ। সবাই বাঙালিতে পরিণত। প্রাচীন মহিমা এ-বইতে রক্ষিত হয় নি ব'লে দুঃখ করার কিছু নেই, কেননা এটি নবরামায়ণ। রামায়ণ বলতে যেমন বাঙলায় বোঝায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তেমনি মহাভারত বলতে বোঝায় কাশীরাম দাসের মহাভারত। কাশীরাম মহাভারতের প্রথম কবি নন, অনেক কবি যখন মহাভারত রচনা ক'রে ভূলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন তখন সতেরোশতকে দেখা দেন বাঙলার বেদব্যাস কাশীরাম দাস। তাঁর মহাভারত অনেকদিন ধ'রে বাঙলার ঘরেঘরে গল্পের স্বাদ এবং ধর্মের পুণ্য বিলিয়ে আসছে। কাশীরামের বিখ্যাত স্তবকটি কে না জানে :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কাশীরাম অবশ্য সারাটি মহাভারত অনুবাদ করেন নি। অনেকে মনে করেন কাশীরাম দাস ১৬০২ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহাভারত রচনা করেন। কাশীরামের পরিবারটি ছিলো কবি-পরিবার, এক বংশে এতো কবির জন্ম বেশি হয় নি। কাশীরামের পিতার নাম কমলাকান্ত। তাঁর বড়ো ভাই লিখেছেন *শ্রীকৃষ্ণবিলাস* নামে একটি কাব্য, ছোটো ভাই গদাধর লিখেছেন *জগতমঙ্গল* নামে একটি কাব্য। আর কাশীরাম তো মহাকবি। প্রচলিত আছে যে কাশীরাম দাস মহাভারত পুরোপুরি অনুবাদ ক'রে যেতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে যে-শ্লোকটি প্রচলিত, তা হচ্ছে :

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥
ধন্য হইল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইয়ের ছেলে এবং আরো কয়েকজন মিলে মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। কাশীরামের মহাভারতের সাথে সংস্কৃত মহাভারতের অমিল অনেক। মহাভারতের শৌর্য সংঘাতের বিরাটত্ব এতে নেই; এ-কাব্য হয়ে উঠেছে বাঙালির মহাভারত এবং পরিণত হয়েছে বাঙলার সাধারণ সম্পত্তিতে।

ভিন্ন প্রদীপ : মুসলমান কবিরা

বাঙলাদেশে মুসলমানদের আগমন এক হাজার বছরের প্রথম প্রধান ঘটনা; দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা ইংরেজদের আগমন। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপের বুড়ো রাজা লক্ষ্মণ সেনকে হঠাৎ আক্রমণ করে। রাজা পালিয়ে

বাঁচে। শুরু হয় এদেশে নতুন যুগ। রাজা গেলো বদলে। শুধু রাজা বদলালো, তাই নয়; সে-কোন সুদূর থেকে এলো বিদেশি রাজা। তাঁদের ধর্ম ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন। তার ফলে দেশে এলো বিরাট আলোড়ন। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থাৎ জীবনের সবদিকে পড়লো তার প্রচণ্ড প্রভাব। মুসলমান রাজারা রাজ্যে একটু আরাম ক'রে বসার পর এদেশের কবিদের দিতে লাগলো উৎসাহ। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানেরা প্রবেশ করে কখন? চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে দেখি বাঙলা ভাষায় কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন মুসলমান কবিরা। বেশ কয়েক শো বছর লেগেছিলো। অবশ্য একথা ভাবার কারণ নেই যে বিদেশ থেকে আসা মুসলমানেরা শুরু করেছিলো বাঙলা কবিতা লেখা। কবিতা যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা এদেশেরই—বাঙালি; শুধু তাঁরা ধর্ম বদলে হয়েছিলেন মুসলমান। বাঙলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম *ইউসুফ-জুলেখা।*

মুসলমান কবিরা কবিতা লেখা শুরু করলেন বাঙলা ভাষায়। তাঁদের কবিতা নানা দিক দিয়ে নতুন। তাঁরা সৃষ্টি করেন বাঙলা কাব্যজগতে এক নতুন ধারা। মধ্যযুগের হিন্দু কবিদের সব কবিতা ধর্মকেন্দ্রিক। দেবতাদের নিয়ে তাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের কাব্যাবলি। মঙ্গলকাব্যে দেখি দেবতাদের লীলাখেলা। বৈষ্ণব পদাবলিতে পাই দেবতার চেয়ে বড়ো রাধা আর কৃষ্ণকে। আরো আগে লেখা *চর্যাপদ* তো ধর্মের নিয়মকানুনের কাব্য। তাই মধ্যযুগে ধর্ম ছাড়া কবিতা ছিলো না। সেখানে মানুষ ছিলো গৌণ, দেবতাই প্রধান। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা কবিরা ভাবতে পারেন নি। মুসলমান কবিরা নিয়ে আসেন নতুন বিষয়বস্তু। মুসলমানদের দেবতা নেই। তাই তাঁরা লেখেন মানুষের গল্প। এ-গল্প কখনো ইউসুফ-জুলেখার, কখনো লাইলি-মজনুর। এরা দেবতা নয়, মানুষ, যদিও অবাস্তব। আধুনিক কালে মানুষই সাহিত্যের মূল বিষয়।

মুসলমান কবিরা যে শুধু মানুষের কথা বলছেন, তা নয়। ধর্ম তাঁদের কবিতারও একটি বড়ো অংশ অধিকার ক'রে আছে। এ-ধর্ম অবশ্য পুরোপুরি কোরানহাদিসের ধর্ম নয়। ইসলামের অনেক গল্প তাঁরা নানা লৌকিক কাহিনীর সাথে মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন। হিন্দুদের একটি বড়ো ঐতিহ্য রয়েছে, সে-ঐতিহ্য রামায়ণের, মহাভারতের। মুসলমানদের ঠিক এমন কোনো কাহিনীভরা ঐতিহ্য নেই। তাই অনেক মুসলমান কবি হিন্দুদের অনুসরণে নতুন নতুন মুসলমান ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছেন। যেমন, ধরা যাক ইউসুফ-জুলেখার গল্প। এ-গল্প কোরানে আছে, বাইবেলে আছে। কিন্তু তা আছে সামান্য হয়ে, অত্যন্ত খসড়া আকারে। কবিরা সেই খসড়া গল্পের গায়ে নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে নতুন কাহিনী গ'ড়ে তুলেছেন তাঁরা।

মুসলমান কবিদের কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখতে পারি। তা হচ্ছে তাঁদের কোনো রচনাই মৌলিক নয়, তাঁরা নিজেরা কোনো গল্পের কাহিনী তৈরি করেন নি। তাঁদের সব রচনাই অনুবাদ। তাঁরা অনুবাদ করেছেন হিন্দি থেকে, ফারসি থেকে, আরবি থেকে। এ-অনুবাদ আজকের দিনের অনুবাদের মতো নয়। আজকের দিনে আমরা যে-বই অনুবাদ করি, তাকে অবিকৃত রাখতে চাই। মূল রচনার কোনো অংশ বাদ দিই না, বা নিজেদের কোনো রচনাংশ ওই বইয়ের মধ্যে জুড়ে দিই না। কিন্তু আমাদের কবিরা অন্য রকম

করেছেন। তাঁরা মূল রচনার কোনো অংশ হয়তো পরিত্যাগ করেছেন, আবার কোথাও নিজের রচনাকে গেঁথে দিয়েছেন। হয়তো তিনি আরবদেশের বই অনুবাদ করছেন। মূল বইতে আছে মরুভূমির কথা। কিন্তু আমাদের কবিরা সেখানে বলেছেন স্নিগ্ধ সজল সবুজ বাঙলার মাঠের কথা। এর ফলে ওই বই অনুবাদ হয়েও আর অনুবাদ থাকে নি, হয়ে উঠেছে নতুন বই। মৌলিক বই। এজন্যে আমাদের কবিদের হাতে মরু অঞ্চলের লাইলি-মজনু হয়ে উঠেছে বাঙলার তরুণতরুণী।

নানা রকমের কবিতা লিখেছেন মুসলমান কবিরা। তাঁরা লিখেছেন কাহিনীকাব্য, লিখেছেন ধর্মীয় কাব্য। তাঁরা লিখেছেন ইতিহাস ও কল্পনা মিলিয়েমিশিয়ে বড়োবড়ো কাব্য। লিখেছেন শোককবিতা, লিখেছেন সঙ্গীতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বই। সবই কবিতায় বা পদ্যে। ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী লিখেছেন শাহ মুহম্মদ সগীর। হানিফা ও কয়রা পরীর গল্প লিখেছেন সাবিরিদ খান। লাইলি-মজনুর প্রণয়ের কথা বলেছেন বাহরাম খান। এগুলো বিদেশের কাহিনীর অনুবাদ। ইউসুফ-জুলেখার গল্প নিয়ে ফারসি ভাষায় বেশ কয়েকজন বড়ো কবি কাব্য লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ফেরদৌসি ও জামি। তাঁদের কারো বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন কবি সগীর। লাইলি-মজনুর গল্প অবলম্বনে ফারসি কবি জামি কাব্য লিখেছিলেন। এ-বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে বাহরাম খানের *লাইলি-মজনু।* মুসলমান কবিরা যে কেবল বিদেশের গল্পেরই অনুবাদ করেছেন, তা নয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত অনেক গল্প তাঁদের আকর্ষণ করেছে, এবং তাঁরা সেগুলো নিয়ে কাব্য লিখেছেন। মনোহর-মধুমালতীর কাহিনী লিখেছেন কবি মুহম্মদ কবির। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে চমৎকার বই লিখেছেন সাবিরিদ খান। মুহম্মদ কবির ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষাংশের কবি। তিনি তাঁর কাব্য *মধুমালতী* লেখা শুরু করেছিলেন ১৫৮৩ অব্দে। সাবিরিদ খানও সম্ভবত ষোড়শ শতকেরই কবি। তাঁর কাব্য আছে বেশ কয়েকটি। *বিদ্যাসুন্দর* ছাড়াও তিনি লিখেছেন *রসুলবিজয়* ও *হানিফা ও কয়রা পরী* নামক আরো দুটি কাব্য। কবি হিশেবে খুব ভালো কবি ছিলেন বাহরাম খান। তাঁর কাব্যের নাম *লাইলি-মজনু*। তিনিও ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর কবি। বাহরাম খান তাঁর কাব্যের শুরুতে একটি বড়ো আত্মকাহিনী বলেছেন। সে থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিলো মুবারক খান। তিনি ছিলেন নিজাম শাহের 'দৌলত উজির' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী। মুবারক খান মারা গেলে নিজাম শাহ কবি বাহরাম খানকে অর্থমন্ত্রী পদটি দান করেন। কবি নগর চট্টগ্রামের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

নগর ফতেয়াবাদ দেখিতে পুরএ সাধ,
চাটিগ্রামে সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম অমর নগর সম,
শতে শতে অনেক নিবাস।
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট
শুভপুরী অতি দীপ্যমান।
চৌদিক বিশাল গড় উজল বিস্তর সর
তাহে শাহা বদর পয়ান ॥

আরেকজন কবি ছিলেন আফজল আলী। তিনি একটি কাব্য লিখেছিলেন, কাব্যটির নাম *নসিহৎনামা*। ইতিহাস ও কল্পনা মিলিয়ে কয়েকজন কবি কাব্য লিখেছিলেন। এসব

কাব্যে ইতিহাস প্রায় রূপকথায় পরিণত হয়েছে। এসব কাব্যে কবিদের উদ্দাম কল্পনা দেখে অবাক হ'তে হয়। এ-রকম কাব্য লিখেছিলেন জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ। কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যের নাম *রসুলবিজয়*, শেখ ফয়জুল্লাহর কাব্যের নাম *গাজিবিজয়*। ফয়জুল্লাহ *গোরক্ষবিজয়* নামে আরো একটি কাব্য লিখেছিলেন। এ-সময়ে আরো বেশ কয়েকজন কবি ছিলেন। তাঁদের নাম চাঁদ কাজি, শেখ কবির, মোজাম্মিল। যাঁদের কথা বললাম তাঁরা সবাই প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর কবি। এ-সময়ে মুসলমান কবিরা একে একে কাব্যরাজ্যে আসছেন আর আসন অধিকার করছেন। তাঁদের কবিতা কাব্যমূল্যে বেশ মূল্যবান, যদিও বড়ো কবি নন তাঁরা। এরপরে আসেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবিরা।

আসেন অনেক কবি। তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ সুলতান, শেখ পরাণ, হাজি মুহম্মদ, মুহম্মদ খান, সৈয়দ মর্তুজা, আবদুল হাকিম, কাজি দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুর, এবং আরো অনেকে। সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, কাজি দৌলত এবং আলাওল বিখ্যাত কবি। তাঁরা সবাই মিলে বাঙলা কবিতাকে এমন সৌন্দর্য দান করেছিলেন, যা তাঁদের সহগামী হিন্দু কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এর ফলে বাঙলা সাহিত্য মধ্যযুগ থেকে হয়ে ওঠে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্পত্তি। তারা উভয়ে মিলে বুনে যেতে থাকে কাব্যলক্ষ্মীর শাড়ির পাড়।

কবি সৈয়দ সুলতানের জীবন ষোড়শ এবং সপ্তদশ দু-শতকে বিস্তৃত ছিলো। তিনি বেঁচেছিলেন অনেকদিন, আর লিখেছিলেন অনেক কাব্য। তাঁর কয়েকটি কাব্য আকারে বিশাল। তাঁর কাব্যশক্তিও ছিলো গৌরবজনক। কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর *শবেমিরাজ* কাব্যে নিজের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যগুলো হচ্ছে *নবীবংশ, শবেমিরাজ, রসুলবিজয়, ওফাতে রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিশনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ*। এছাড়া তিনি লিখেছেন মারফতি গান এবং পদাবলি। কবির *নবীবংশ* বিশাল বই। এ-কাব্যে কবির ইসলামপ্রচারক মনটি স্পষ্ট দেখা যায়। কবি এ-কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন :

> কহে ছৈয়দ সুলতানে শুন নরগণ।
> এহি হিন্দি নবীবংশ শুন দিয়া মন ॥
> আছিল আরবী ভাষে হিন্দি করিলুঁ।
> বঙ্গদেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলুঁ ॥
> ন বুঝি আরবী শাস্ত্র জ্ঞান ন পাইলা।
> হিন্দিয়ানি ভাষা পাই আচার জানিলা ॥

কবি হাজি মুহম্মদের একটি কাব্য পাওয়া গেছে, কাব্যটির নাম *নূরজামাল*। কবি মুহম্মদ খানের কাব্যও আছে বেশ কয়েকটি। তাঁর কাব্যের নাম *সত্যকলি-বিবাদসংবাদ, হানিফার লড়াই, মুকতাল হোসেন*।

মধ্যযুগের একজন ভালো কবি কবি আবদুল হাকিম। তাঁর আটটি কাব্যের খবর পাওয়া গেছে। তাঁর কয়েকটি কাব্যের নাম হচ্ছে *ইউসুফ-জুলেখা, নূরনামা, কারবালা, শহরনামা*। কবি আবদুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। সেই মধ্যযুগেই একদল মুসলমান দেখা দিয়েছিলো যারা নিজেদের বাঙালি বলতে চাইতো না। তারা নিজেদের আরবইরানের মানুষ ভাবতে চাইতো। বাঙলা ভাষাকে তারা অবজ্ঞা

করতো। আবদুল হাকিম এদের ওপর ভয়ানক ক্ষেপেছিলেন। এসব পরগাছাদের নিন্দা ক'রে তিনি লিখেছিলেন অমর কতিপয় পংক্তি; সে-পংক্তিগুলো আছে তাঁর *নূরনামা* কাব্যে। পংক্তিগুলো তুলে দিচ্ছি :

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায় ॥
মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি ॥

এ-অংশ পড়লে বোঝা যায় কবি কী গভীরভাবে বাঙালি ছিলেন। বর্তমানের বাঙালিদের তিনি যথার্থ পূর্বপুরুষ; তবে তিনি যাদের নিন্দা করছেন, তারা এখনো আছে বাঙলায়।

মধ্যযুগে আরাকানেও রচিত হয়েছিলো বাঙলা সাহিত্য। এই আরাকানের প্রাচীন নাম ছিলো রোসাঙ্গ। আরাকানের রাজদরবারে স্থান পেয়েছিলেন বাঙলা ভাষার কয়েকজন ভালো কবি। তাঁদের মধ্যে আছেন আলাওল, কাজি দৌলত, মাগন ঠাকুর। এ-কবি তিনজনের সবাই সপ্তদশ শতকের মানুষ। কাজি দৌলত লিখেছিলেন একটি কাব্য; নাম *সতীময়না* বা *লোরচন্দ্রানী*। কাব্যটি তিনি নিজে সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেন নি। কিছু অংশ লেখার পরে তিনি পরলোকগমন করেন। পরে কাব্যটি সমাপ্ত করেন আলাওল। কাজি দৌলত জন্মগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে। বয়স হবার পরে তিনি আরাকানের রাজসভায় যান, এবং আরাকানের রাজা সুধর্মের সেনাপতি আশরাফ খানের প্রীতি লাভ করেন। আশরাফ খানের উৎসাহে তিনি রচনা করেন *সতীময়না* নামক কাব্যটি।

আলাওল ছিলেন আরাকানের রাজসভার আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের বড়ো কবিদের একজন। তাঁর কথা পরে পৃথকভাবে বলবো। কবি আলাওলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মাগণ ঠাকুর। তাঁর নামটি অদ্ভুত; তবে তিনি ছিলেন মুসলমান। তিনি ছিলেন আরাকানের অধিবাসী। মাগন ঠাকুরও একটি ভালো কাব্য লিখেছিলেন *চন্দ্রাবতী* নামে। তিনিও বেশ ভালো কবি ছিলেন।

মুসলমান কবিদের সংবাদ আমরা সব জানি না। কেননা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্যে যখন তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়, তখন মুসলমান কবিদের কাব্য বিশেষ সংগ্রহ করা হয় নি। কে করবে ? মুসলমানেরা চিরদিনই এসব বিষয়ে উদাসীন। তবু কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে একজন মহাপুরুষের চেষ্টায়। তাঁর নাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ [১৮৭১–১৯৫৩]। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। তিনি গ্রামেগ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন মুসলমান কবিদের পুথি। যদি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ না জন্মাতেন, তাহলে হয়তো মুসলমান কবিদের সাধনার কথা জানতে পেতাম না। তাই তিনি চিরস্মরণীয়।

আলাওল

আলাওল, কবি; বড়ো কবি। তিনি লিখেছেন অনেকগুলো কাব্য, আর প্রত্যেক কাব্যে লিখেছেন অসংখ্য ভালো কবিতার পংক্তি। তিনি সপ্তদশ শতকের কবি। তাঁর কবিতা পড়ার সময় আগে মনে দাগ কাটে তাঁর ভাষা। সে-সময় কবিরা ভাষার দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। কিন্তু আলাওল কবিতা লেখার সময় ভাষাকে ভাবতেন দেবতা, তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেন। সেকালের অনেক বড়োবড়ো কবি ছিলেন ভাষার ব্যবহারে গ্রাম্য। তাঁরা যে-কোনো শব্দকে কবিতার চরণে ঠাঁই দিতেন। কবি আলাওল ছিলেন অন্যরকম। ভাষাকে সাজাতেন নানা অলঙ্কারে, অনেক অপ্রচলিত মনোহর শব্দকে তিনি ডেকে আনতেন এবং কবিতাকে করে তুলতেন সুনির্মিত প্রাসাদের মতো চমৎকার। আলাওলের *"পদ্মাবতী"* কাব্যটি পড়ার সময় বারবার মনে হয় যেনো ক্রমশ একটি সযত্নে নির্মিত প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করছি। তার কক্ষেকক্ষে ছড়িয়ে আছে সৌন্দর্য।

আলাওল সপ্তদশ শতকের কবি। তাঁর জন্ম, জন্মস্থান ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন, তিনি ফরিদপুরের লোক; কেউ বলেন, আলাওল চট্টগ্রামের মানুষ। তবে একথা ঠিক তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে চট্টগ্রামে, বিশেষ ক'রে আরাকানে। আলাওল বিভিন্ন কাব্যে নিজের কথা বলেছেন। তা থেকে জানা যায় কবি আলাওলের জীবন শাদামাটা ছিলো না, তাতে আছে অনেক উত্থানপতন, আছে রোমাঞ্চ, আছে জীবনের সুখ ও দুঃখের টানাপোড়েন। কবির পিতা ছিলেন ফতেহাবাদ অঞ্চলের অধিপতি মজলিশ কুতুবের প্রধান কর্মচারী। একসময়ে আলাওল তাঁর পিতার সাথে নৌকো ক'রে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে-সময় বাঙলার নদীতেনদীতে দস্যুতা ক'রে ফিরতো পর্তুগিজরা। আলাওলের পিতার নৌকো আক্রমণ করে পর্তুগিজ জলদস্যুরা। অনেকক্ষণ লড়াই হয় তাদের মধ্যে। সে-লড়াইয়ে আলাওলের পিতা নিহত হন। কবির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। অনেক কষ্টের মুখে আলাওল আসেন আরাকানে। আলাওলের বয়স তখন কম; ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে। আলাওল ভর্তি হন আরাকানের রাজার অশ্বারোহী সেনাবাহিনীতে। সে-সময় আরাকানের রাজদরবারে অনেক নামকরা মুসলমান কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা কবি আলাওলের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন কবিতা রচনা করতে। তাঁদের উৎসাহ পেয়ে সৈনিক আলাওল কবি হয়ে ওঠেন। কবি আলাওল তাঁর জীবনের যে-সব কথা বলেছেন, তা শোনার মতো। তিনি *পদ্মাবতী* কাব্যে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার খানিকটা :

মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাত জালালপুর পুণ্যবন্ত স্থান ॥
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলামা।
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা ॥
মজলিশ কুতুব তাহাতে অধিপতি।
মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি॥
কার্যগতি যাইতে পথে বিধির গঠন।

হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ॥...
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গ আসিয়া হৈলুং রাজ আসোয়ার ॥

আলাওল কবি হয়ে উঠলেন। খ্যাতি লাভ করলেন। কিন্তু তখন ঘনিয়ে আসে আরেক বিপদ। শাহ সুজা তখন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে আরাকানে। কিছুদিন পরে সুজাকে হত্যা করা হয় রাজদ্রোহিতার অপরাধে। আলাওলকেও জড়ানো হয় এ-দ্রোহিতার সাথে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি শাহ সুজার লোক। এ-অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, এবং পঞ্চাশ দিন বিনা বিচারে আটক রাখা হয় কারাগারে। আলাওলের শেষ জীবনও সুখে কাটে নি, রাজা তাঁর ওপর সুনজর রাখে নি ব'লে। কবি তাঁর এ-দুঃসময় সম্বন্ধে বলেছেন, 'আয়ুবশ আমারে রাখিল বিধাতায়। সবে ভিক্ষা প্রাণ রক্ষা ক্লেশে দিন যায়।' কবি তাঁর বিভিন্ন কাব্যে এ-সময়ের বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন সাশ্রু নয়নে। কবি আরো বলেছেন, 'মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।'

কবি আলাওল সম্ভবত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫৯৭ অব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৭৩ অব্দে। আলাওল যখন আরাকানে আসেন তখন আরাকানের রাজা ছিলেন থদোমিন্তার। থদোমিন্তারের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন মাগণ ঠাকুর। আলাওল মাগণ ঠাকুরের প্রীতি লাভ করেন, এবং তাঁরই উৎসাহে মনোযোগ দেন কাব্যরচনায়। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম *পদ্মাবতী*। এ-কাব্য আলাওল রচনা করেন মাগণ ঠাকুরের অনুরোধে। *পদ্মাবতী* রচিত হয় ১৬৪৮ সালে। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির *পদুমাবত-এর* কাব্যানুবাদ। আলাওলের জীবনে মাগণ ঠাকুরের প্রভাব অসীম; তিনি কবিকে কয়েকটি কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মাগণ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি অনুবাদ করেন ফারসি কাব্য, *সয়ফলমূলক-বদিউজ্জামাল*। কাব্যটি তিনি শেষ করতে পারেন নি। বইটি যখন অনেকখানি লেখা হয়ে গেছে, তখন অকস্মাৎ লোকান্তরিত হন কবির উৎসাহদাতা মাগণ ঠাকুর। তাই কবি এটাকে অসমাপ্ত রেখে দেন। আলাওলের আর একটি কাব্যের নাম *হপ্তপয়কর;* এটিও একটি অনুবাদ কাব্য। এটির মূল রচয়িতা ফারসি কবি নিজামী। ১৬৫৯ সালে কবির যখন বেশি বয়স তখন তিনি আরাকানের আরো একজন বড়ো কবির একটি অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন। সে-কবির নাম কাজী দৌলত; তাঁর কাব্যের নাম *সতীময়না*। এ-কাব্যটি তিনি রচনা করেন সুলায়মান নামক এক ভদ্রলোকের অনুপ্রেরণায়। আলাওলের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য আছে। সেগুলো হলো *তোহ্‌ফা, দারাসেকেন্দারনামা*। *সেকেন্দারনামা* কাব্যটির মূল লেখক কবি নিজামী। এ-কাব্য তিনি যখন রচনা করেন তখন কবি আলাওল ছিলেন মজলিশ নবরাজ নামক এক ভদ্রলোকের আশ্রিত। আলাওল কেবল বড়ো বড়ো কাহিনীকাব্য রচনা করেন নি, তিনি লিখেছিলেন পদাবলিও। এগুলোও আলাওলের প্রতিভার স্বাক্ষর।

আলাওলের প্রধান কাব্য কোনটি? *পদ্মাবতী*। বাঙলা কবিতা আলাওলকে এ-কাব্যের জন্যে এতোদিন স্মরণে রেখেছে, এবং রাখবে আরো বহুদিন। আলাওলের *পদ্মাবতী* যদিও অনুবাদ কাব্য, তবু এটি নতুন সৃষ্টি। প্রাচীন হিন্দি ভাষার মহাকবি ছিলেন মালিক মুহম্মদ জায়সি। তিনি পদ্মাবতী-রত্নসেন-নাগমতী-আলাউদ্দিন খিলজির মনোহর কাহিনী রচনা

করেছিলেন *পদুমাবত* নামে। এ-গল্পের কাহিনীকে ঐতিহাসিক কাহিনী মনে হ'লেও এ কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস নয়। পদ্মাবতী নামক এক অপরূপ রূপসী রাজকন্যার কাহিনী অনেক দিন ধ'রে এদেশে প্রচলিত। সেই কাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন কবি জায়সি। জায়সির এ-কাব্য নিজের মতো ক'রে অনুবাদ করেন কবি আলাওল।

পদ্মাবতীর কাহিনীটি সুন্দর। পদ্মাবতী ছিলো সিংহলরাজকন্যা। অপরূপ রূপসী। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি এক পাখির মুখে শোনে চিতোর-রাজ রত্নসেন। সে সিংহলে যায়, এবং লাভ করে পদ্মাবতীকে। ফিরে আসে দেশে। তখন দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি। সে একদিন শোনে পদ্মাবতীর অপরূপ রূপের কথা। সে রত্নসেনের কাছে দাবি করে পদ্মাবতীকে। এতে রত্নসেন রেগে যায়, এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। আলাউদ্দিন যুদ্ধে না পেরে কৌশলে বন্দী করে রত্নসেনকে। কিন্তু পরে মুক্ত হয় রত্নসেন। ওদিকে আরেক রাজা, যার নাম দেবপাল, সেও পদ্মাবতীকে লাভ করতে চায়। দেবপাল ও রত্নসেনের মধ্যে এ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে লাভ হয় না কারো, সবাই প্রাণ হারায়। যুদ্ধে প্রাণ হারায় দেবপাল এবং আহত হন রত্নসেন। আহত রত্নসেন পরে মারা যায়। সতী নারী অপরূপ রূপসী পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় উঠে সহমরণ বরণ করে। মালিক মুহম্মদ জায়সির কাহিনীটি রূপক, অর্থাৎ তিনি এ-পৃথিবীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে শোনাতে চেয়েছিলেন মানবজীবনের গূঢ় কথা। তবে আমাদের সে-কথায় কোনো লোভ নেই, আমরা চাই চমৎকার গল্প আর কবিতা। মালিক মুহম্মদ দুটিই দিয়ে গেছেন। আলাওল সে-কাব্য অনুবাদ করেন বাঙলা ভাষায়।

আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্য থেকে তাঁর রচনার কিছু উদাহরণ তুলে আনছি। এ-অংশে কবি পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের কবিতার একটি রীতি ছিলো নায়িকার রূপের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া। আজকাল আর তেমন হয় না। আজকাল লেখকেরা নায়কনায়িকার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চান ইঙ্গিতে। মধ্যযুগে ছিলো অন্যরকম। তখন কবিরা নায়িকার রূপ আপাদমস্তক বর্ণনা করতেন। বলতেন তার চুল কেমন, চোখ কেমন, ঠোঁট কেমন ইত্যাদি। শরীরের কোনো অংশ বাদ দেয়া হতো না। রূপ বর্ণনায় কবিরা ব্যবহার করতেন একটির পর একটি উপমা। এর ফলে নায়িকার বিশেষ বিশেষ অঙ্গের রূপ সত্যিই ফুটে উঠতো। কিন্তু মুশকিল হতো সারা শরীর নিয়ে। দেখা যেতো সুন্দর সুন্দর অঙ্গের অদ্ভুত সংস্থানে নায়িকারা অদ্ভুত হয়ে পড়েছে। আলাওলের বর্ণনা শোনা যাক :

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি ত্রিভুবন মাঝ ॥
আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহাঅন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হন্তে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্যমাঝে মহাসূক্ষ্ম পথ॥

পদ্মাবতীর রূপ অপূর্ব, তবে কবির ভাষা বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। কবি কী বলছেন এখানে? আসলে কবি নন, এক হীরামণ পাখি রত্নসেনকে বলছে, মহারাজ পদ্মাবতীর রূপের কথা আমি আর কী বলবো! তার সাথে তুলনা দিতে পারি এমন জিনিশ তো ত্রিভুবনে নেই। তার মাথার কেশরাশি পা পর্যন্ত লম্বা, আর তাতে ভরপুর সর্বদা মৃগনাভির সৌরভ। সে-কেশরাশি এতো কালো যে চোখের দৃষ্টি সেখানে পরাজিত হয়, তা রাত্রির মতো। তোমরা যখন বড়ো হবে চুল সম্বন্ধে একজন আধুনিক কবির এরকম এক অসাধারণ পংক্তির সাক্ষাৎ পাবে। সে-কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে 'বনলতা সেন'। জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের চুলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' চমৎকার না? যাক, আমরা আলাওলে ফিরে আসি। কবি এরপরে সিঁথির কথা বলছেন। পদ্মাবতীর সিঁথি কেমন? তা খুব সরু, সুন্দর, তীক্ষ্ণ, এমনকি তরবারির তীক্ষ্ণতার চেয়েও অধিকতর তীক্ষ্ণ পদ্মাবতীর সিঁথি। তারপর কবি একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সে-সিঁথির সৌন্দর্য। বলছেন, ওই সিঁথির রেখাকে মনে হয় যেনো কালো মেঘের মধ্যে স্থির হয়ে আছে বিদ্যুৎরেখা। এতেও কবির মন ভরে নি। তাই তিনি দেন আরো একটি উপমা। বলেন, স্বর্গ থেকে আসা-যাওয়ার জন্যে সৌন্দর্যের দেবতা অরণ্যের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পথ নির্মাণ করেছিলেন, পদ্মাবতীর সিঁথি তেমনি সুন্দর, নয়নাভিরাম। আলাওল কিন্তু খুব সহজ কবি নন। তিনি কথা বলেন উপমায়, অলঙ্কারে এবং অনেক সময় বেশ শক্ত শব্দে। তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ার মতো কবি।

লোকসাহিত্য : বুকের বাঁশরি

আমরা বাতাসের সাগরে ডুবে আছি। তবু অনেক সময় মনে থাকে না যে আমাদের ঘিরে আছে বাতাস। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একবার বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলেন লোকসাহিত্যকে। বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে, তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে লোকসাহিত্য। কিন্তু তার কথা আমাদের মনে থাকে না। তা যে বাতাসের মতোই উদার, বাতাসের মতোই সীমাহীন। যে-সাহিত্য লেখা হয় নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে-সাহিত্য পায় নি সমাজের উঁচুতলার লোকদের আদর, যে-সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানেগানে, যে-সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ-সাহিত্য বেঁচে আছে শুধুমাত্র পল্লীর মানুষের ভালোবাসা ও স্মৃতি সম্বল ক'রে। অনেক ছড়া আমরা পড়ি, জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা? এগুলো অনেক দিন ধ'রে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে। অনেক গীতিকা আমরা শুনি, জানি না কখন কোন কবি লিখেছিলেন এ-বেদনাময় কাহিনী। এ-সবই লোকসাহিত্যের সম্পদ।

লিখিত সাহিত্যের থাকে নির্দিষ্ট লেখক। কিন্তু লোকসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় যেনো সারা সমাজ একসাথে ব'সে নিজেদের

মনের কথা গানের সুরে বলেছে। তা লেখা হয় নি কাগজে বা তালপাতায়। তবে তা লেখা হয়েছে মানুষের হৃদয়ে। গ্রামের মানুষ সে-গান মনে রেখেছে, আনন্দে বেদনায় তা গেয়েছে। এভাবে বেঁচে আছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশের রীতি বেশ চমৎকার। ধরা যাক ছড়ার কথা। কখন যে কার মনে কোন ঘটনা দাগ কেটেছে, এবং সে ঘটনা ছন্দ লাভ করেছে, তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই ছড়া একজনের কাছ থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা সমাজে। সমাজের যখন ভালো লেগেছে ছড়াটিকে, তখন সেটিকে মুখেমুখে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। এভাবে ছড়াটি হয়ে উঠেছে সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। কোনো নির্দিষ্ট লেখকের নাম আর পাওয়া যায় না। আবার ধরা যাক কোনো গীতিকার কথা। গীতিকা হয় বেশ দীর্ঘ; তাতে বড়ো কাহিনী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ গীতিকার লেখকের নাম পাওয়া যায় না। কেনো পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় না, কেননা হয়তো তার কোনো একজন নির্দিষ্ট কবি নেই, অনেকের মনের কথা হয়তো জমাট বেঁধে একটি গীতিকায় রূপ পেয়েছে। আবার হয়তো কোনো একজন কবি মূলে সত্যিই রচনা করেছিলেন গীতিকাটি। রচনা হয়ে যাওয়ার পরে তিনি সেটি গান করেন সকলের সামনে। ভালো লাগে সকলের গীতিকাটি। তখন সমাজের লোকেরা মুখস্থ ক'রে নেয় গীতিকাটিকে। তারপর কেটে যায় অনেক বছর। যে কবি আগে রচনা করেছিলেন গীতিকাটি, কালের প্রবাহে তাঁর নাম যায় হারিয়ে, তখন গীতিকাটি হয়ে ওঠে সারা সমাজের সৃষ্টি। কেননা কবির রচনা এর মধ্যে অনেক বদলে গেছে মানুষের কণ্ঠেকণ্ঠে ফিরেফিরে।

বাঙলা সাহিত্য বেশ ধনী লোকসাহিত্যে। প্রচুর লোকসাহিত্য আছে আমাদের। গ্রামেগ্রামে ছড়িয়ে ছিলো, এবং আজো আছে। ভদ্রলোকেরা এর সংবাদ অনেক দিন জানতো না। কেননা লোকসাহিত্য লিখিত হয় নি, তা বেঁচে ছিলো গ্রামের মানুষের মনে। তারাই ছিলো লোকসাহিত্যের লালনপালনকারী। তারপর এক সময় আসে যখন ভদ্রলোকদের দৃষ্টি পড়ে সেদিকে। শুরু হয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ। বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় অনেক ছড়া, অনেক গীতিকা। আমরা সেগুলোর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। বাঙলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্যে যাঁদের নাম বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চন্দ্রকুমার দে [১৮৮৯–১৯৪৬]। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী। লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিলো প্রবল অনুরাগ; তাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো গীতিকা। তাঁর সংগৃহীত গীতিকাগুলোকে সম্পাদনা ক'রে *ময়মনসিংহ গীতিকা* (১৯২০) নামে প্রকাশ করেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র সেন নিজে সংগ্রাহক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ছিলো লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। তিনি লোকসাহিত্যকে দেশেবিদেশে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লোকসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো ছড়া। কেবল ছড়া সংগ্রহ ক'রে তিনি থেমে যান নি। লোকসাহিত্যের ওপর একটি অসাধারণ বইও তিনি লিখেছিলেন *লোকসাহিত্য* নামে। এ-বই লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে। রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার [১৮৭৭–১৯৫৭], উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী [১৮৬৩–১৯১৫]। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের রূপকথা সংগ্রহের নাম *ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি*। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম *টুনটুনির বই*। এছাড়া আছেন আরো অনেক সংগ্রাহক, যাঁদের সকলের চেষ্টায় আমরা পাচ্ছি এক অপূর্ব লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার।

লোকসাহিত্যের পৃথিবী পল্লী। লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ফুটিয়েছে ফুলের মতোন, বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতোন। এ-সাহিত্যে আছে সরল অনুভবের কথা, এ-সরলতাই সকলকে মোহিত করে। লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরি। লোকসাহিত্যে দেখা যায় অতি সহজ ক'রে অনেক গভীর কথা বলা হয়েছে। লোকসাহিত্যের কবিদের যেনো চিন্তা করার দরকারই ছিলো না, তাঁরা অবলীলায় ব'লে যেতেন তাঁদের কথা। তাই লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় চমৎকার সহজ উপমা, সরল বর্ণনা। লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার কিন্তু অনেক বড়ো, অনেক বিশাল। অনেক রকমের সৃষ্টি সেখানে দেখা যায়। লোকসাহিত্যে কী কী আছে? আছে ছড়া, প্রবাদ, আছে গীতি, গীতিকা, ধাঁধা, রূপকথা, এবং আরো অনেক কিছু। আমরা সব সময় না হ'লেও মাঝে মাঝে ছড়া কাটি, এ-ছড়া লোকসাহিত্যের এক গৌরব। গীতি ও গীতিকা লোকসাহিত্যের অনেকখানি অধিকার ক'রে আছে। প্রবাদের কথা তো সবাই জানে, আর ছোটোরা ভালোবাসে রূপকথা—কেমন অশ্চার্য সে-সব গল্প।

ছড়া বড়ো মজার। সারাটি বাল্যকালই তো আমাদের কাটে ছড়ার যাদুমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ক'রে। কে এমন আছে যে বাল্যকালে মাথা দুলিয়ে ছড়া কাটে নি? ছড়ায় যাদু আছে। যে-সব কথা থাকে ছড়ার মধ্যে তার অনেক সময় কোনো অর্থই হয় না, বা অর্থ খুঁজে পাই না; তার এক পংক্তির অর্থ বুঝি তো পরের পংক্তির মানে বুঝি না। ছড়া আসলে অর্থের জন্যে নয়, তা ছন্দের জন্যে, সুরের জন্যে। অনেক আবোলতাবোল কথা থাকে তার মধ্যে, এ-আবোলতাবোল কথাই মধুর হয়ে ওঠে ছন্দের নাচের জন্যে। একটি ছড়া শোনা যাক :

> আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
> ঝাঁঝর কাসর মৃদঙ্গ বাজে

দুটি পংক্তি আমরা গুণগুণ করলাম। এর অর্থ বোঝার কোনো দরকার নেই। তুমি কেবল এর ছন্দে মাতাল হও, এর ভেতর যে কোনো অর্থ থাকতে পারে তার কথা একেবারে ভুলে যাও, কেবল এর ছন্দের যাদুতে নাচো, নাচো। ছড়ায় কোনোই অর্থ থাকে না, সে-কথা অবশ্যি পুরো সত্যি নয়। ছড়ায় অর্থ থাকে গভীর গোপনে, অনেক তলে লুকিয়ে; সে ধরা দিতে চায় না, কেননা তার অর্থটা বড়ো নয়। একটি ছড়া, যার ভেতর অনেক দুঃখ লুকিয়ে আছে, তুলে আনছি :

> ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
> বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে
> ধান ফুরুলো পান ফুরুলো খাজনার উপায় কি
> আর কিছু কাল সবুর করো রসুন বুনেছি

এটা একটি ঘুমপাড়ানো ছড়া। এর ছন্দ নাচের চঞ্চল ছন্দ নয়, এর পংক্তিতে পংক্তিতে আছে স্বপ্নময় ঘুমের আবেশ। কিন্তু এটির ভেতর ছেঁড়া সুতোর মতো রয়ে গেছে বর্গীদের অত্যাচারের কথা। বর্গীরা অর্থাৎ মারাঠি দস্যুরা একসময় বাঙলায় ত্রাসের রাজত্ব পেতেছিলো; ছড়াটির মধ্যে ধরা আছে তার স্মৃতি। ছড়ার মাঝে এভাবে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস। কিন্তু ছড়ার স্বাদ তার ছন্দে, তার মন্ত্রের মতো ধ্বনিতে।

গীতিকা লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গীতিকা ছড়ার মতো ছোটো নয়, গীতিকা আকারে অনেক বড়ো। এতে বলা হয় নরনারীর জীবন ও হৃদয়ের কথা। বাঙলা ভাষায় গীতিকার বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। এসকল গীতিকার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে *মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, মলুয়া*। এগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *ময়মনসিংহ গীতিকায়*। গীতিকাসমূহে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর হৃদয় দেয়ানেয়ার বিষাদময় কাহিনী বর্ণনা করা হয়। গীতিকার নায়কনায়িকারা পল্লীর গাছপালার মতো সরল সবুজ, তারা পরস্পরকে ছাড়া আর কিছু জানে না। এর ফলে গীতিকায় পাওয়া যায় চিরকালের নরনারীর কামনাবাসনার কাহিনী।

একটি গীতিকার কাহিনী বলছি। গীতিকাটির নাম *মহুয়া*। এক বেদের দল ছিলো, তার সর্দার হুমরা বেদে। বেদেরা সাধারণত কঠিন মানুষ হয়, হুমরা বেদেও তেমনি। তারা জীবিকা অর্জন করতো নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে। একবার হুমরা বেদে কাঞ্চনপুর গ্রামে খেলা দেখাতে যায়। সে-গ্রাম থেকে হুমরা একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ-মেয়ের নাম হয় মহুয়া। মহুয়া হুমরাকে জানতো তার পিতা ব'লে। বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। বড়ো হয় মহুয়া। সে দেখতে অপূর্ব সুন্দর। সে খেলাও দেখায় অপূর্ব। একবার হুমরা বেদের দল খেলা দেখাতে যায় বামনকান্দা গ্রামে। সে-গ্রামের এক যুবক, যার নাম নদের চাঁদ, মহুয়ার খেলা এবং মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। মহুয়াও মুগ্ধ হয় নদের চাঁদকে দেখে। তারা ভালোবেসে ফেলে একে অপরকে। একথা জানতে পারে হুমরা বেদে। সে তার দলবল এবং মহুয়াকে নিয়ে আবার পালিয়ে যায়। কিন্তু নদের চাঁদ ও মহুয়া কেউ ভোলে না কারো কথা। অনেক খুঁজে আবার নদের চাঁদ দেখা পায় মহুয়ার। হুমরা মহুয়াকে আদেশ দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করার। তার বদলে মহুয়া ও নদের চাঁদ যায় পালিয়ে। তারা বাসা বাঁধে, সুখে সময় কাটাতে থাকে। কিন্তু সুখ তাদের জন্যে নেই। তাদের ভুলে যায় নি হুমরা বেদে। হুমরা বেদে খুঁজতে থাকে নদের চাঁদ ও মহুয়াকে। একসময় দেখা পায় এ-সুখী দম্পতির। তার মনে জ্ব'লে ওঠে আগুনের মতো প্রতিহিংসা। হুমরা বেদে মহুয়ার হাতে তুলে দেয় বিষমাখা ছুরি, বলে নদের চাঁদকে হত্যা করতে। কিন্তু কীভাবে এ সম্ভব, কেননা নদের চাঁদ যে তার কাছে নিজের চেয়েও প্রিয়। তাই মহুয়া পারে নি বেদের আদেশ মানতে। কিন্তু বেদের আদেশ অবশ্য পালনীয়, একথা সে জানতো। তাই মহুয়া নদের চাঁদের বদলে নিজের কোমল বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে বিষাক্ত ছুরিকা। সাথেসাথে হুমরার সাথীরা হত্যা করে নদের চাঁদকে। তাদের দুজনকে কবর দেয়া হয় পাশাপাশি। তারপর চ'লে যায় বেদেরা। শুধু থাকে একজন তাদের কবরের পাশে মোমবাতির মতো জেগে; সে মহুয়ার চিরদিনের বান্ধবী পালঙ। বড়ো বেদনার গল্প *মহুয়া*।

বাঙলা সাহিত্যে যে-কটি বিখ্যাত গীতিকা আছে, তাদের সবগুলোই প্রায় সংগ্রহ করা হয়েছিলো ময়মনসিংহ জেলা থেকে। বাঙলার গীতিকাগুলোর সৌন্দর্য অশেষ। মধ্যযুগের কাহিনীকাব্যগুলোর মধ্যে এগুলোই শ্রেষ্ঠ : মঙ্গলকাব্য এগুলোর পাশে খুবই ম্লান।

দ্বিতীয় অন্ধকার

বাঙলা সাহিত্যের শুরুতে আছে একটি আঁধার যুগ। তখন দেড়শো বছর কেটেছে অন্ধকারে। সে-সময়ের কোনো লেখা আসে নি আমাদের হাতে। আবার মধ্যযুগ যখন শেষ হয়, তখন নামে সামান্য অন্ধকার। অবশ্য এমন নয় যে এ-সময় কিছু লেখা হয় নি। লেখা হয়েছে, অনেক লেখা হয়েছে। তার প্রায় সবটাই এসেছে আমাদের কাছে। কিন্তু তবু এ-সময়ে আমাদের সাহিত্যের আঙিনায় আলোর অভাব পড়েছিলো; নেমেছিলো অন্ধকার। মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে অনেক মূল্যবান সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগ একসময় শেষ হয়ে আসে। দেশে দেখা দেয় নানা বিপর্যয়। সুজলা সুফলা বাঙলায় দেখা দেয় হাহাকার। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তন। ১৭৫৭ অব্দে আমরা হারাই স্বাধীনতা। ইংরেজরা বাণিজ্য করতে এসে দখল ক'রে নেয় আমাদের দেশ। বণিক হয় শাসক। রাজা বদল হয়। শুধু যে রাজাই বদলায় তা নয়, বদলে যায় অনেক কিছু। অর্থাৎ সমাজের যে-ভিত্তি এতোদিন অকম্পিত ছিলো, তা ওঠে ভয়ংকরভাবে নড়ে। সমাজে সৃষ্টি হয় নতুন ধনিক শ্রেণী। আগে যারা ছিলো সমাজের মাথা, তারা পিছিয়ে পড়ে, এগিয়ে যায় যারা ছিলো পেছনে। সাহিত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। আয়নায় যেমন আমরা দেখি নিজেদের, তেমনি সাহিত্যে দেখা যায় দেশকালের ছবি। আগে সাহিত্য রচিত হতো সমাজের বড়ো বড়ো মানুষের উৎসাহে; তারা চাইতো উৎকৃষ্ট সাহিত্য। কিন্তু ১৭৬০-এর পরে সাহিত্যের সে-মর্যাদা আর রইলো না। কেননা আগে যারা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলো, তারা হারিয়ে ফেলে তাদের আগের মর্যাদা। সমাজে দেখা দেয় নতুন ধনী শ্রেণী। এরা সাধারণত বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা করতো। ব্যবসা ক'রে তারা জমিয়ে তোলে অনেক টাকা। তাদের অনেক টাকা ছিলো, কিন্তু ছিলো না রুচি। কিন্তু তারাও চায় আনন্দ, চায় উৎসব। সাহিত্য আনন্দ দানের একটি বড়ো উপায়। তাই এ-নতুন ধনীরা চায় সাহিত্য। কিন্তু উন্নত সাহিত্যের স্বাদ তারা গ্রহণ করতে পারে নি। তাদের জন্যে দরকার হয় হাল্কা, নিম্নরুচির সাহিত্য। এ-সাহিত্য সরবরাহ করেন একশ্রেণীর কবি। তাঁদের বলা হয় 'কবিওয়ালা'। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন মুসলমান, তাঁদের 'শায়ের'ও বলা হয়। তাঁরা কবি নন, কবিঅলা।

সতেরো শো ষাট থেকে আঠারো শো তিরিশ। সত্তর বছর সময়। এ-সময় আমাদের সাহিত্যের পতন ঘটেছিলো। ১৭৬০-এ মারা যান মধ্যযুগের শেষ বড়ো কবি ভারতচন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনায়ও রয়েছে পতনের পরিচয়। রুচির অভাব রয়েছে ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের পরে কবিওয়ালা এবং শায়েররা সে-পতনকে পূর্ণ করেন। তাই এ-সময়ের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গর্ব করা যায় না। এ সময়টাকে দেখা হয় একটু করুণার সাথে। এ-সময়ে যাঁরা কবিতা রচনা করেন তাঁদের কবিও বলা হয় না, বলা হয় কবিওয়ালা বা কবিয়াল। কেননা, তাঁরা কবিদের সম্মান রক্ষা করেন নি। কবিরা হন আত্মসম্মানী, অর্থের কাছে তাঁরা বিকিয়ে যান না। কিন্তু এ-সময়ের কবিরা অনেকটা বিকিয়ে গিয়েছিলেন, নিজেদের রুচিকে করেছিলেন খাটো। তাঁরা কবিতা লিখতেন না, রচনা করতেন মুখেমুখে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে। কবিওয়ালারা করতেন কবিতাযুদ্ধ। একটি মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেন দু-দল কবি। তাঁদের একদল প্রথমে অপর দলের উদ্দেশে পদ্যে কিছু বলতেন। তাঁদের বলা যখন শেষ হতো তখন অন্য দলের কবিরা আগের দলের

কথার জবাব দিতেন। প্রথম দলের কথাকে বলা হয় 'চাপান' এবং দ্বিতীয় দলের কথাকে বলা হয় 'উতোর'। কবিদের কথা কাটাকাটি বেশ জ'মে উঠতো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অনবরত পদ্য রচনা করতেন তাঁরা। তাঁদের কথায় রুচির বিশেষ ছোঁয়া থাকতো না। রুচিতে বা কবিতায় তাঁদের বিশেষ লোভ ছিলো না, তাঁদের লক্ষ্য ছিলো যেমন ক'রে হোক বিপক্ষকে হারানো। আজো বাঙলার গ্রামে এ-কবিগান শুনতে পাওয়া যায়।

কবিগান ছিলো অনেক রকমের। যেমন : তর্জা, পাঁচালি, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়া-কবিগান, বসা-কবিগান, ঢপ, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি। এ-কবিদের একটি গুণ কিন্তু স্বীকার করতেই হয়। তা হচ্ছে তাঁদের পটুত্ব; অবলীলায় তাঁরা রচনা করতেন এক-একটি পংক্তি। হয়তো ছন্দে ভুল থাকতো মাঝেমাঝে, শব্দও ব্যবহৃত হতো বেঢপ রকমের, তবু তাতে কী? তাঁরা তো আনন্দ দিতেন। তাঁদের ব্যবহৃত শব্দগুলোও হতো শ্রোতাদের পুলকিত করার মতো। বাঙলা, ফারসি, ইংরেজি অনেকরকম শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ওই কবিগানের স্বর্ণযুগ। তবে আজো কবিগান ম'রে যায় নি, গ্রামাঞ্চলে তা বেঁচে আছে।

কবিগানরচয়িতাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২–১৮৫৯]। তিনি উনিশশতকের প্রথম ভাগের একমাত্র কবি। তিনি নিজে একসময় ছিলেন কবিওয়ালাদের দলে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কবিওয়ালাদের রচনার অনেক স্বাদ পাওয়া যায়। কবিওয়ালাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রাচীন, তাঁর নামটি বড়ো অদ্ভুত। তাঁর নাম গোঁজলা গুই [আনুমানিক ১৭০৪—?]। তিনি ছিলেন আঠারোশতকের প্রথম দিকের মানুষ। গান গাইতেন ধনীদের বাড়িতে। কবিওয়ালারা যাঁর কাছে গান রচনা শিখতেন তাঁকে গুরু বলে মান্য করতেন, তাই প্রত্যেক কবির এক একজন ক'রে গুরুর নাম পাওয়া যায়। কয়েকজন বিখ্যাত কবিওয়ালার নাম : রাম বসু, রাসু, নৃসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, কেষ্টা মুচি, ভবানী, রামানন্দ নন্দী। রাসু ও নৃসিংহ ছিলেন দুভাই। ফরাসি চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। হরু ঠাকুর ছিলেন খুবই খ্যাতিমান। তিনি জন্মেছিলেন ১৭৪৯ সালে, আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৪ সালে। রাম বসু ছিলেন আরেকজন বিখ্যাত কবিওয়ালা। তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৭৮৬ সালে, আর মৃত্যু হয় ১৮২৮ সালে। কবি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন পর্তুগিজ। তিনিও হয়েছিলেন বাঙলার কবি, তবু তাঁর নামের সাথে জড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি শব্দটি। রাম বসু আর অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি সমসাময়িক ছিলেন, তাঁরা একই মঞ্চে প্রতিযোগিতায় নামতেন। একটি নমুনা দিচ্ছি।

রাম বসু বলছেন :

বল হে অ্যান্টনি আমি একটি কথা জানতে চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেনো কুর্তি নাই ॥

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বলছেন :

এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি ॥

বেশ মজার নয়?

টপ্পার রাজা ছিলেন নিধুবাবু [১৭৪১–১৮৩০]। তাঁর পুরোনাম রামনিধি গুপ্ত। তাঁর পিতার নাম ছিলো হরিনারায়ণ গুপ্ত। তাঁর টপ্পায় মুগ্ধ হতো শ্রোতারা। তাঁর একটি অমর গান আছে। গানটির কয়েকটি পংক্তি :

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা,
পূরে কি আশা?
কতো নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু
মিটে কি তৃষা?

এ-সময়ে মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছিলেন শায়েররা। তাঁরা মনোরঞ্জন করতেন গঞ্জের ব্যবসায়ীদের; শোনাতেন নানা রকমের ইসলামি কাহিনী। তাঁরা যে-গান বেঁধেছিলেন, তাকে আজকাল বলা হয় 'পুথিসাহিত্য'। অনেকে তাঁদের রচনাকে বলেন 'মিশ্রভাষারীতির কাব্য'। তাঁদের কবিতা আধুনিক কালে কলকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছিলো ব'লে এ-বইগুলোকে 'বটতলার পুথি'ও বলা হয়। এতো সব নাম, এবং নামগুলো দেখে বোঝা যায়, এ-শ্রেণীর কাব্যকেও বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয় না। এগুলো সত্যিই উন্নতমানের সাহিত্য নয়; এখানে মানুষের শস্তা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা আছে। এ-কবিরা অনেক বড়ো বড়ো কাহিনী শুনিয়েছেন শ্রোতাদের। সে-সব কাহিনী যেমন আজগুবি, তেমনি মোটা রসের। আসলে এগুলো বুড়োদের জন্যে পরীর গল্প। এ-কবিরা শুনিয়েছেন ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী, লাইলি-মজনু, হাতেমতায়ীর কেচ্ছা, লিখেছেন জঙ্গনামা, আমিরহামজার কথা। এ-সব রচনায় সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে কবিদের ভাষা। ভাষার ক্ষেত্রে এ-কবিরা হৈচৈ ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা কাব্য লিখেছিলেন বাঙলা ভাষায়, কিন্তু তাঁদের হাতে বাঙলা ভাষার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিলো। তাঁরা পংক্তিকে জমজমাট ক'রে তুলতেন আরবিফারসি শব্দে, মাঝেমাঝে ইংরেজি শব্দেও। বাঙলা শব্দ ব্যবহৃত হতো ততোটুকু, যতোটুকু না হ'লেই নয়। এ-কবিতাগুলো যখন ছাপা হয় প্রথমে, তখন সেগুলো ছাপা হয়েছিলো আরবিফারসির মতো ডান দিক থেকে। সব দিকেই এ-কবিরা এক কোলাহল পাকিয়ে তুলেছিলেন। তাঁদের ভাষার নমুনা :

কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ॥

কিছু বোঝা গেলো? এখানে এগারোটি শব্দ আছে, তার মাত্র চারটি বাঙলা। তবু এ-কাব্য বাঙলা! এ-কবিরা অনেক সময় তালজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান সবই হারিয়ে ফেলতেন। এক কবি লিখেছেন :

ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।
কিছু দূর যাইয়া মর্দ রওনা হইল ॥

মর্দ ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে হেঁটে যায়, আর কিছুদূর যাওয়ার পর রওনা হয়। অদ্ভুত জগতের অধিবাসী কবি আর তাঁর কাব্যের মর্দ!

শায়েররা যে-সব কাহিনী লিখেছিলেন, সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একদিকে তাঁরা লিখেছেন মানুষমানুষীর মন দেয়ানেয়ার গল্প, অন্যদিকে তাঁরা লিখেছেন ইতিহাস আর কল্পনা মিশিয়ে পরধর্মীকে পরাজিত করার কাহিনী। তাঁদের অনেক কাহিনীতে দেখা যায় হিন্দুদের দেবদেবীর সাথে মুসলমান পীরফকিরদের সংঘর্ষের চিত্র। সব মিলে

এক রোমাঞ্চকর আজব বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন এ-কবিবৃন্দ। তাঁদের কল্পনা ছিলো শিশুসুলভ, তা ডানা মেলতো সকল অসম্ভবের মধ্যে। সব গল্পে কথায় কথায় আসে দৈত্য-দানব-পরীরা, নায়ক বা নায়িকা চল্লিশ মণ পানি খেয়ে ফেলে একবারে।

এ-শ্রেণীর সাহিত্য রচনা ক'রে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ। তাঁদের মধ্যে প্রথম দুজনই এ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠপুরুষ। ফকির গরীবুল্লাহ ছিলেন হুগলি জেলার হাফিজপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর কাব্যগুলো হচ্ছে *ইউসুফজুলেখা, আমির হামজা* (প্রথম পর্ব), *জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুথি*। কবি সৈয়দ হামজা ১৭৩৩ সালে হুগলি জেলার উদনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরও কাব্য আছে বেশ কয়েকটি। যেমন *মধুমালতী, আমির হামজা* (দ্বিতীয় পর্ব), *জৈগুণের পুথি, হাতেমতাই* । আরেক কবি, যাঁর নাম জয়নাল আবেদিন, রচনা করেছিলেন *আবু সামা* নামে একটি কাব্য। মোহাম্মদ দানেশ রচনা করেছিলেন *গুলবে-সানোয়ারা, নুরুল ইমান, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই* নামে কয়েকটি কাব্য।

কবিওয়ালা ও শায়েররা মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে উদ্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা কোনো অসাধারণ সৃষ্টি রেখে যেতে পারেন নি পরবর্তীকালের জন্যে। এর জন্যে তাঁদের কোনো দোষ নেই। দোষ যদি কিছু থাকে, তবে তা দেশের ও কালের। দেশ গিয়েছিলো নষ্ট হয়ে, কাল গিয়েছিলো পতিত হয়ে। নষ্ট কালে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে তাঁরা প্রদীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে-প্রদীপ জ্বলতে চায় নি উজ্জ্বলভাবে। তাই এ-সময়ে আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্যের আঙিনায়। তবু তো কিছুটা আলো ছিলো; আলো জ্বেলেছিলেন এ-কবিরা, তাই তাঁরা স্মরণীয়।।

অভিনব আলোর ঝলক

আসে উনিশশতক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকেদিকে সাড়া প'ড়ে যায়। উনিশশতকে সূচনা হয় বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের। এ-আধুনিকতা, যাকে বলেছি অভিনব আলো, তার কিরণ পড়ে সাহিত্যের সমগ্র ভুবনে। মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য ছিলো সংকীর্ণ; সবগুলো শাখা বিকশিত হয় নি তাতে। উনিশশতকে বিকশিত হয় তার সব শাখা, বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ সাহিত্য। আধুনিকতা কাকে বলে? মানুষ যখন যুক্তিতে আস্থা আনে, যখন সে আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে, যখন সে মানুষকে মানুষ বলে মূল্য দেয়, তখন সে হয়ে ওঠে আধুনিক। আধুনিকতার আছে আরো অনেক বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগেও আমরা দেখেছি মাঝেমাঝে এসব বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা জীবনের সকল প্রান্তকে ছোঁয় নি। উনিশশতকে এ-বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় প্রধান হয়ে। সাহিত্যের রূপও যায় বদলে। উনিশশতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বাঙলা গদ্যের বিকাশ। প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ স্থান ছিলো না। তখন যা কিছু রচিত হয়েছে সবই হয়েছে পদ্যে, ছন্দ মিলিয়ে। কিন্তু পদ্যে কি সব কথা বলা যায়?

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকেরা নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলেন বাঙলা গদ্য। এ-গদ্য বাঙলা সাহিত্যের আধুনিকতার পথকে করেছে অনেকখানি পরিষ্কার। মধ্যযুগে হৃদয়ের আবেগ, কল্পিত কাহিনী, জীবনকাহিনী সবকিছু রচিত হয়েছে ছন্দে, পয়ারে। তাই তাতে জীবনের সবকিছু তুলে ধরা সম্ভব ছিলো না। এর ফলে তখনকার বাঙলা সাহিত্য থেকেছে সীমাবদ্ধ। গদ্যের বিকাশের ফলে সাহিত্য লাভ করে বিস্তৃতি। সাহিত্যজগতে দেখা দেয় নানা বৈচিত্র্য। মুদ্রাযন্ত্রের অর্থাৎ ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা সাহিত্যকে সাহায্য করে। আগে সাহিত্য সীমিত থাকতো বিশেষ কিছু মানুষের বৃত্তে; কেননা কোনো বইয়ের অনেকগুলো কপি করা ছিলো কষ্টকর। কিন্তু উনিশশতকে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাপাখানা। লেখকেরা আর গুটিকয় শ্রোতার উদ্দেশে কবিতা বা গল্প বা প্রবন্ধ রচনা করেন নি। তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকেন অসংখ্য অদৃশ্য পাঠককে লক্ষ্য ক'রে। আগে এটি সম্ভব ছিলো না। আগে কবিরা মনে রাখতেন না শুধু, একেবারে চোখের সামনে দেখতে পেতেন তাঁদের শ্রোতাদের। তাঁরা জানতেন কোন রসে তাঁদের শ্রোতারা মোহিত হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র লেখক ও পাঠকের মধ্যে আনে দূরত্ব, আনে বিস্তৃতি। লেখকের মনের সামনে তখন ভাসতে থাকে বিশাল পাঠকশ্রেণীর মুখ, তাই তাঁরা হন আরো যত্নশীল। মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈচিত্র্যের বেশ অভাব। নবযুগে আসে বৈচিত্র্য। গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০–১৮৯১]। প্রথম উপন্যাস রচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮১৪–১৮৮৩]। ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা মজার কাহিনী লেখেন কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০–১৮৭০]। কবিতায় নবযুগ আনেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪–১৮৭৩]। তিনি রচনা করেন মহাকাব্য। বাঙলা সাহিত্যে মহাকাব্য ছিলো না, কবি মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কবিতাকে ক'রে তোলেন আধুনিক। তিনি কবিতাকে সুরের আওতা থেকে মুক্ত ক'রে তাকে ক'রে তোলেন পাঠ্য। কথাটিকে আরো একটু বিশদ ক'রে বলা যাক। মধ্যযুগে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা। সেগুলো কিন্তু পাঠের জন্যে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিলো গান করার জন্যে। কবিরা তখন সুর ক'রে গান করতেন তাঁদের কাব্য। মধুসূদন কবিতা লেখেন পাঠেরই জন্যে, গানের জন্যে নয়। এজন্যে তাঁর কবিতা সুরের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। তাছাড়া তিনি পয়ারকে দেন নতুন রূপ। সৃষ্টি করেন অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

মধুসূদন একাই বাঙলা সাহিত্যকে পাঁচশো বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন। মধুসূদন লেখেন বাঙলা ভাষার প্রথম ট্রাজেডি, লেখেন প্রহসন, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। তিনি আমাদের চেতনায় সঞ্চার ক'রে দেন আধুনিকতা। বাঙলা ভাষায় যথার্থ উপন্যাস সৃষ্টি হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [১৮৩৮–১৮৯৪] হাতে। তিনি তাঁর উপন্যাস, সমালোচনা, বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ, এবং আরো অনেক রকম রচনার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে এগিয়ে দেন। এছাড়া উনিশশতকে রচিত হয় প্রবন্ধ, লেখা হয় বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ, রচিত হয় আত্মজীবনী, নাটক, গল্প, সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান, দর্শন। প্রতিষ্ঠিত হয় দৈনিক সংবাদপত্র, সাহিত্যসাময়িকী। এসব নির্ভর ক'রে বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক কাল প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশতকে। উনিশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠে অভিনব সাহিত্য। যেমন তার বিস্তার, তেমনি তার গভীরতা। মধ্যযুগে একশো বছরে যা রচিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি রচিত হয়েছে উনিশশতকের একেকটি দশকে। এক-একজন লেখক লিখেছেন আগের যুগের দশজন লেখকের সমান। কিছু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সৃষ্টি না হ'লেও বিকশিত হয় বাঙলা গদ্য। তখন ওই কলেজের প্রধান ছিলেন পাদ্রি উইলিয়ম কেরি [১৭৬১–১৮৩৪]। তাঁকে গদ্য রচনায় সাহায্য করেন এদেশের পণ্ডিতেরা। এক পণ্ডিত রামরাম বসুর [১৭৫৭–১৮১৩] লেখা *প্রতাপাদিত্যচরিত্র* এখান থেকে প্রকাশিত প্রথম বাঙলা গদ্যগ্রন্থ। বইটি ছাপা হয় ১৮০১ অব্দে। রামরাম বসু আরো একটি বই লেখেন; তার নাম *লিপিমালা*। পাদ্রি কেরি লেখেন *কথোপকথন* নামে একটি বই। গোলকনাথ শর্মা লেখেন *হিতোপদেশ*, চণ্ডীচরণ মুনশি লেখেন *তোতা ইতিহাস*, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লেখেন *রাজাবলি*, *হিতোপদেশ*, *প্রবোধচন্দ্রিকা*, *বত্রিশ সিংহাসন* এবং আরো কয়েকজন লেখক কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো সবই প্রকাশ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ-বইগুলো বাঙলা গদ্যকে অনেকটা আকার দান করে। এরপরে বাঙলা গদ্যের বিকাশে সহায়তা করেন কয়েকজন অতি বিখ্যাত বাঙালি। তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু। তাঁদের পরে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত।

রামমোহন রায় [১৭৭২–১৮৩৩] লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। তাঁর বইগুলোর মধ্যে আছে *বেদান্তগ্রন্থ* (১৮১৫), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩)। রামমোহন রায়ের লেখায় বিকাশ ঘটে বাঙালির চিন্তার। বিদ্যাসাগরের হাতে বাঙলা গদ্য লাভ করে সুষ্ঠু রূপ। বিদ্যাসাগরের বইগুলোর মধ্যে আছে *বেতালপঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৬৩), *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯), *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *স্বরচিত জীবনচরিত* (১৮৯১), এবং আরো কয়েকটি বই। বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের স্থপতি। তারাশঙ্কর তর্করত্ন লিখেছেন *কাদম্বরী* (১৮৫৪), *রাসেলাস* (১৮৫৭)। এ-শতকে আছেন আরো অনেকে। ধীরে ধীরে বলা হবে তাঁদের কথা।

গদ্য : নতুন সম্রাট

বাঙলা ভাষায় গদ্য উনিশশতকের শ্রেষ্ঠ উপহার। আজ চারদিকে গদ্যের জয়জয়কার, গদ্য ছাড়া আজ এক মুহূর্ত চলে না। গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখা হচ্ছে গদ্যে; প্রবন্ধ গদ্য ছাড়া লেখাই যায় না; এমনকি কবিতাও আজকাল লেখা হচ্ছে গদ্যে, যেমন আগে প্রবন্ধ লেখা হতো কবিতায়। আধুনিক জীবন গদ্যশাসিত; বর্তমানের প্রভু হচ্ছে গদ্য। গদ্য আগেও ছিলো, বিকশিত হ'তে শুরু করে উনিশশতকের প্রথম দশকে। ব্যাপক হয়ে ওঠে পরবর্তী দশকগুলোতে। উনিশশতকের আগে গদ্য ছিলো, তবে গদ্য লেখা হয়েছে খুবই কম। বাঙলা ভাষার উদ্যমশীল গবেষকেরা অনেক গবেষণা করে উনিশশতকের আগে যে গদ্য ছিলো, তা প্রমাণ করেছেন। সে-গদ্য যেনো গদ্যের জন্মের আগের অবস্থা, তাকে অচেনা

লাগে। সে-গদ্যের নমুনা রয়েছে মধ্যযুগের কিছু চম্পূকাব্যে, আছে কিছু দলিল ও চিঠিপত্রে। চম্পূকাব্য হচ্ছে গদ্যেপদ্যে লেখা কাব্য।

মধ্যযুগের কিছু দলিলে বাঙলা গদ্যের আদিরূপ পাওয়া গেছে, এবং পাওয়া গেছে কিছুকিছু চিঠিতে। এরকম একটি চিঠি হচ্ছে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের। তিনি এ-মূল্যবান চিঠিটি ১৫৫৫ অব্দে লিখেছিলেন অহোমরাজ স্বর্গদেবকে। এ-চিঠি পড়লে মনে হয় যেনো যে-শিশু সদ্য কথা বলতে শিখছে, সে কারো কাছে চিঠি লিখেছে। একটি দলিল পাওয়া গেছে ১৬৯৬ সালে লেখা। এছাড়া আরো কিছু চিঠি এবং সাহিত্য নয়, এরকম গদ্য রচনা পাওয়া গেছে মধ্যযুগের। এসব রচনা দেখলে শুধু দুঃখ বাড়ে, কেননা প'ড়ে বুঝতে হ'লে ভীষণ কষ্ট করতে হয়।

বাঙলা গদ্যের বিকাশে বিদেশিদের অবদান অসামান্য। এটা স্বীকার করা ভালো। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা বলার সময় তা বোঝা যাবে। তবে আঠারোশতকেই বিদেশিরা মন দিয়ে বাঙলা গদ্য লেখা শুরু করেছিলেন। এ-বিদেশিরা ছিলেন পর্তুগিজ। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে তিনটি বাঙলা গদ্যে লেখা বই মুদ্রিত হয়। বই তিনটির দুটি রচনা করেছিলেন একজন পর্তুগিজ। বইগুলো যদিও লেখা বাঙলা ভাষায়, কিন্তু এগুলো ছাপা হয়েছিলো রোমান অক্ষরে। আর ছাপাও হয়েছিলো বাঙলাদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত লিসবনে। বই তিনটির একটির লেখক দোম আনতোনিও। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার ভূষণা অঞ্চলের জমিদারের পুত্র। তাঁর বইয়ের নাম *ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ*। অপর বই দুটির লেখক পাদ্রি মনোএল দা আস্সুম্পসাঁউ। পাদ্রি মনোএল-এর একটি বইয়ের নাম *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*, এবং অপর বইটির নাম *বাঙলা-পর্তুগিজ অভিধান। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* বইটি রচিত হয়েছিলো ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে, ভাওয়াল পরগণায়। তাঁর অভিধানটিও রচিত হয়েছিলো ভাওয়ালেই।

এসব সত্ত্বেও বাঙলা গদ্য উনিশশতকেরই উপহার। এ-উপহার দানের গৌরব সবার আগে দাবি করতে পারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এ-কলেজে গ'ড়ে ওঠে গদ্য। তাই বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ একটি বড়ো অধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ৪ তারিখে। ইংরেজরা এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করে এ-কলেজ। ইংরেজরা তখন দেশের রাজা। বিলেত থেকে এদেশে আসতো তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। যোগ্যতার সাথে শাসনের জন্যে তাদের পরিচয় থাকার দরকার ছিলো এ-দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ওপর ভার পড়ে রাজকর্মচারীদের এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলার। তাদের শিক্ষা কেন্দ্র ক'রে এ-কলেজে বিকশিত হয় বাঙলা গদ্য।

১৮০১ অব্দে উইলিয়ম কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকরূপে। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়ে মনোযোগ দেন গদ্যের বিকাশে। তাঁর সহায়ক হন কয়েকজন পণ্ডিত। এ-পণ্ডিতদের মধ্যে আছেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, এবং আরো কয়েকজন। পণ্ডিতেরা কেরির পরিচালনায় বিকাশ ঘটাতে থাকেন গদ্যের। কেরি নিজেও ব'সে ছিলেন না, তিনিও গদ্যের সাধনায় নামেন। এর ফলে শুরু হয় বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ। এখানে অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয় নি, সিভিলিয়ানরা যাতে সহজে এ-দেশের নানা কিছুর সাথে পরিচিত হ'তে পারে, বই রচনার

সময় তা লক্ষ্য রাখা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তককে নির্ভর ক'রেই বেড়ে ওঠে গদ্য। এখান থেকে যে-সব বই প্রকাশিত হতো, সেগুলোর দাম ছিলো কিন্তু বেশ। তাই সবাই সে-বই কিনতে পারতো না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাঙলা গদ্যকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারেন নি, তাঁরা শুধু ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮২৬-এর মধ্যে এ-কলেজ থেকে বেরোয় অনেকগুলো বাঙলা বই।

বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালির লেখা যে-বইটি সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাপাখানা থেকে বেরোয়, সেটির নাম *প্রতাপাদিত্যচরিত্র*। বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। বইটি লিখেছিলেন রামরাম বসু। তিনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। তাঁর বই সবার আগে ছাপা হয়েছিলো, এজন্যেই তো আমরা তাঁকে চিরকাল মনে রাখবো। গদ্যলেখক হিশেবেও তিনি একেবারে ফেলনা নন। তিনি লিখেছিলেন আরো একটি বই। বইটির নাম *লিপিমালা*। এটি বেরিয়েছিলো ১৮০২ অব্দে। রামরাম বসুর জীবন খুব রোমাঞ্চকর। তিনি কেরিকে বাঙলা শিখিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যিনি ছিলেন পরিচালক, সেই উইলিয়ম কেরিও লিখেছিলেন কয়েকটি বই। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য *কথোপকথন*। এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বিতীয় বই; প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮০১-এ। এ-বইটি কলকাতা ও শ্রীরামপুর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথন। মানুষেরা নানা বিষয়ে কথা বলেছে এ-বইতে। তাই এ-বইটিতে সেকালের মানুষের মুখের ভাষার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কেরি এ-দেশের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এ-বই পড়লে বোঝা যায় তিনি এদেশবাসীকে কেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছিলেন। এখানে নানা শ্রেণীর মানুষ কথা বলেছে: কথা বলেছে মেয়েরা, বুড়োরা, উঁচুশ্রেণীরা, নিচুশ্রেণীরা। কেরি যেনো তাঁর বইতে নিজে কিছু না লিখে সত্যিকার মানুষের কথাবার্তা অবিকল তুলে দিয়েছেন। কেরির *কথোপকথন* -এ সেকালের মেয়েরা কথা বলে এভাবে :

> তোমার কয় যা।
> আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।
> কেমন যায় যায় ভাব আছে কি কালের মতো।
> আহা ঠাকুরাণী আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক বুদ্ধি করে না।

বেশ সহজ সরল নরম না কথাগুলো? কেরির আরো একটি বই হচ্ছে *ইতিহাসমালা*। বইটি বেরিয়েছিলো ১৮১২ অব্দে। এতে আছে কয়েকটি গল্প। সহজ সরলভাবে বলা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি বই লিখেছিলেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার [১৭৬২–১৮১৯]। তিনি প্রতি মাসে বেতন পেতেন দুশো টাকা। তিনি লিখেছিলেন পাঁচটি বই, তার মধ্যে চারটি প্রকাশ করেছিলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তাঁর বইগুলো হচ্ছে *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮০২), *হিতোপদেশ* (১৮০৮), *রাজাবলি* (১৮০৮), *প্রবোধচন্দ্রিকা* (১৮১৩)। তাঁর আরেকটি বই *বেদান্তচন্দ্রিকা* (১৮১৭)। বাঙলা গদ্যকে সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচনায় একজন ভালো শিল্পীর হাতের ছোঁয়া লক্ষ্য করার মতো। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরো যাঁরা লেখক ছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুনশি,

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায়। তারিণীচরণ লিখেছিলেন *এশপের কাহিনী* (১৮০৩), চণ্ডীচরণ লিখেছিলেন *তোতা ইতিহাস* (১৮০৫), রাজীবলোচন লিখেছিলেন *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (১৮০৫)। রামকিশোর লিখেছেন *হিতোপদেশ* (১৮০৮) এবং হরপ্রসাদ রায় লিখেছেন *পুরুষপরীক্ষা* (১৮১৫)। এ-সকল বই ব্যতীত উইলিয়ম কেরি দু-খণ্ডে সংকলন করেন *বাঙলা ভাষার অভিধান*। এর প্রথম খণ্ডটি বেরোয় ১৮১৫ অব্দে, এবং দ্বিতীয়টি বেরোয় ১৮২৫-এ। অসাধারণ এ-অভিধান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা বাঙলা গদ্যের বিকাশে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে তাঁদের গদ্য পরিপূর্ণ বিকশিত নয়; পাঠ্যপুস্তকও পুরোপুরি পাঠ্যপুস্তক নয়। তাঁদের লেখা প'ড়ে বুঝতে কষ্ট হয়। এমন অনেক শব্দ আছে যা আজ আর কেউ ব্যবহার করে না। তাছাড়া এ-গদ্যে দাঁড়ি নেই, কমা নেই, সেমিকোলন নেই; নেই আরো অনেক কিছু। পণ্ডিতেরা ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তাই তাঁরা অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ। তবে এ-গদ্যের আলোতেই পথ দেখেছেন পরবর্তী গদ্যলেখকেরা। এরপরে এসেছেন অনেক বড়ো বড়ো গদ্যশিল্পী। যেমন, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁরা বাঙলা গদ্যকে ভেঙেছেন, নতুন ক'রে গড়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পর বাঙলা গদ্য লাভ করেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার লালনপালন। পত্রপত্রিকা গদ্যের প্রবাহকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। উনিশশতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হয়েছিলো সাময়িকপত্র, বাঙলা গদ্য এসকল পত্রপত্রিকা আশ্রয় ক'রে বেড়ে ওঠে। পত্রপত্রিকাগুলোতে থাকতো নানা জ্ঞানের কথা, নানা রসের কথা, থাকতো নানা বাদপ্রতিবাদ। এর ফলে গদ্যের সীমাও যায় বেড়ে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে গদ্যের পরিধি ছিলো সীমিত, কেননা সেখানে রচিত হয়েছে শুধু পাঠ্যবই। জীবনের সকল দিকের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য ছিলো না। পত্রপত্রিকার লক্ষ্য জীবনের সবদিকে। তাই গদ্য বিস্তার লাভ করে।

বাঙলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। পত্রিকাটির নাম *দিকদর্শন*। এ-পত্রিকায় বাঙলা গদ্য বেশ সহজ সরলভাবে ব্যবহৃত হয়। শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮-তে বেরোয় আরো একটি পত্রিকা। নাম *সমাচার দর্পণ*। এটি ছিলো সাপ্তাহিক পত্র। এর সম্পাদক ছিলেন জে সি মার্শম্যান। এ-পত্রিকায় চাকুরি করতেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি।

বাঙালিদের প্রচেষ্টায় যে-পত্রিকাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তার নাম *বাঙ্গালা গেজেটি*। এটি ছিলো সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮১৮ সালের মে মাসের ১৪ তারিখে। পত্রিকাটি বেশিদিন বাঁচে নি। সব পত্রিকার মধ্যে *সমাচার দর্পণ-এর* অবদান উল্লেখযোগ্য। এ-পত্রিকাটিতে সাহিত্য-ভাষা-রাজনীতি-ইতিহাস নানাবিধ বিষয় ঠাঁই পেতো। এ-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিলো উনিশশতকের প্রথম দিকের বিখ্যাত নকশা "বাবু উপাখ্যান"।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ রায় ছদ্মনামে প্রকাশ করেন *ব্রাহ্মণ-সেবধি* নামে একটি মাসিক পত্রিকা। রামমোহন ভালো গদ্যলেখক ছিলেন; এ-পত্রিকাটিতে তাই মোটামুটি ভালো গদ্য স্থান পেতো। ১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরো একটি পত্রিকা। নাম

সম্বাদকৌমুদী। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি বের হতো প্রতি মঙ্গলবারে। ভবানীচরণ ছিলেন একজন ভালো লেখক। তিনি লিখেছিলেন একটি নামকরা বই—*কলিকাতা কমলালয়।* পরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বের করেছিলেন আরেকটি পত্রিকা, *সমাচারচন্দ্রিকা* নামে। এ-পত্রিকার প্রধান কাজ ছিলো সতীদাহপ্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে লেখা। ভবানীচরণ রক্ষণশীল ছিলেন; তিনি বিরোধিতা করেছিলেন সেকালের অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনের। তবে তিনি রচনা করেছিলেন কয়েকটি বই। সেগুলো হচ্ছে *কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস*।

কিন্তু সব পত্রপত্রিকাকে ছাপিয়ে উঠেছিলো একটি পত্রিকা, সেটির নাম *সম্বাদপ্রভাকর।* এটির সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পত্রিকাটি সাপ্তাহিকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারিতে। ১৮৩৯ সালে এটি পরিণত হয় দৈনিক পত্রিকায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন নামকরা কবি, তাঁর গদ্যও বেশ ভালো। তিনি উনিশশতকের অন্তত দুজন মহৎ লেখককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। একজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপরজন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। এ-পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বাঙলার সাহিত্যসংস্কৃতিকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। তাই এতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো গদ্য-পদ্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা। ঈশ্বরগুপ্ত *প্রভাকর*-এর পাতাতেই প্রকাশ করেন প্রাচীন কবিদের জীবনী, প্রকাশ করেন কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যের পরিচয়। এভাবে জীবনের সকল দিক উন্মোচিত হওয়ার সাথে বিকশিত হয়েছিলো বাঙলা গদ্য। ১৮৮১ সালে বের হয় *জ্ঞানান্বেষণ* নামে একটি পত্রিকা। এ-সকল পত্রপত্রিকা আশ্রয় ক'রে বাঙলা গদ্য অনেকখানি সবলতা লাভ করে। সবলতা আসে সবদিকে। ভাষা ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। গদ্যের প্রয়োজন তো সর্বত্র। তাই তার রূপও হওয়া দরকার বিচিত্র। গদ্য যখন ব্যবহৃত হয় প্রবন্ধে তখন তার রূপ এক, যখন গদ্য ব্যবহৃত হয় উপন্যাসে তখন তার রূপ আরেক। যখন গদ্য হালকা রচনায় ব্যবহৃত হয় তখন তা থাকে এক রকম, যখন তা ব্যবহৃত হয় গুরু রচনায়, তখন তা হয় অন্যরকম। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় গদ্যে আসে এ-বৈচিত্র্য। তবে বাঙলা গদ্যকে সাবলীল ক'রে তোলেন মহৎ গদ্যশিল্পীরা।

গদ্যের জনক ও প্রধান পুরুষেরা

বিভিন্ন লেখকের হাতের স্পর্শে বাঙলা গদ্য ধীরেধীরে ধারণ করেছিলো নিজের প্রকৃত রূপ। কেউ রচনা করেছিলেন পাঠ্যবই লেখার উপযোগী গদ্য, কেউ গদ্যকে ক'রে তুলেছিলেন যুক্তিতর্কের উপযোগী। কারো হাতে গদ্য হয়ে উঠেছিলো গল্পের উপযোগী, কারো হাতে হয়ে উঠেছিলো সমালোচনা সাহিত্যের উপযোগী। কিন্তু উনিশশতকের প্রথম দু-তিন দশক ধ'রে চলে গদ্যের বিকাশ ও সুস্থিতির কাজ। এমন কোনো বড়ো গদ্যশিল্পী তখন দেখা দেন নি, যাঁর গদ্যকে বলা যেতে পারে নিটোল গদ্য। উনিশশতকের দ্বিতীয় দশকে আবির্ভূত হন রামমোহন রায় [১৭৭২–১৮৩৩]। তিনি ছিলেন কৃতী পুরুষ, নতুন কালের মহাপুরুষ। বাঙলা গদ্যে তাঁর দানও উল্লেখযোগ্য। রামমোহন সবার আগে গদ্যকে পাঠ্যবইয়ের বৃত্ত

থেকে বিস্তৃততর এলাকায় নিয়ে যান। রামমোহন ছিলেন সংস্কারক। তাই তাঁকে তর্কবিতর্কে নামতে হয়েছে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে। তিনি বিরোধীপক্ষকে আঘাত করেছেন নানা রচনায়, আর এ-আঘাতে দল মেলেছে গদ্য। রামমোহন রচনা করেছিলেন বেশ কয়েকটি বাঙলা বই। সেগুলো হচ্ছে *বেদান্ত গ্রন্থ* (১৮১৫), *বেদান্তসার* (১৮১৫), *ভট্টাচার্যের সহিত বিচার* (১৮১৭), *গোস্বামীর সহিত বিচার* (১৮১৮), *প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *পথ্যপ্রদান* (১৮২৩), *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩)। এছাড়া তিনি সম্পাদনা করেছিলেন দুটি পত্রিকা, *ব্রাহ্মণসেবধি* ও *সম্বাদকৌমুদী*। এসকল রচনা ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে ওঠে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত গদ্য। রামমোহনের গদ্য পাঠের সময় এক প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের লেখা পাঠ করছি, একথা সব সময় মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর গদ্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে তিনি জলের মতো সহজ গদ্য লেখেন। তবে তাঁর গদ্য বিশেষ সরস নয়। আসলে রামমোহনের গদ্য ঠিক জলের মতো ছিলো না, এ-গদ্য অনেকটা জটিল, বাক্যগুলো বড়ো বড়ো, এলানোছড়ানো। অনেক সময় তাঁর ভাষা কর্কশ। দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনেরও অভাব আছে। তবু রামমোহন রায় বাঙলা গদ্যের এক প্রধান ব্যক্তি।

যাঁর হাতের ছোঁয়ায় বাঙলা গদ্য রূপময় হয়ে ওঠে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০–১৮৯১]। তাঁকে বলা হয় বাঙলা গদ্যের জনক। বিদ্যাসাগর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন। তিনি বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, একথা সবাই জানি। এসব কথা যদি স্মৃতিহীন বাঙালি কখনো ভুলেও যায়, তবু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর অনুপম গদ্য রচনার জন্যে। তাঁর গদ্য রচনাকে কেউ ভুলতে পারবে না। আজ আমরা যে-গদ্য রচনা করি, তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর সে-ভিত্তির ওপর কতো রঙবেরঙের প্রাসাদ উঠেছে এবং আরো কতো উঠবে, তবু তিনি থাকবেন সবার মূলে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২০ অব্দে, মেদেনিপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ঠাকুর দাস, মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাল্যকালে তিনি দুষ্টু চঞ্চল ছিলেন, ছিলেন বড়ো একরোখা। পরবর্তী জীবনে তিনি হন নির্ভীক, এবং ভীষণভাবে একরোখা। তাঁর সম্বন্ধে গল্প আছে, বাল্যকালে তাঁকে যা বলা হতো তিনি করতেন তার উল্টোটি। যদি মা বলতেন পড়ো, তাহলে তিনি পড়া বন্ধ করতেন। তাই তাঁর মা শীতকালে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে বলতেন কিছুতেই স্নান কোরো না, আর অমনি বালক ঈশ্বর লাফিয়ে পড়তেন জলে। এ-বালক পরে হয়ে উঠেছিলেন বাঙলার মহত্তম ব্যক্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের অস্থির রূপটিকে স্থির ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি রচনা করেছেন নানা রকমের বই। লিখেছেন পাঠ্যবই, করেছেন অনুবাদ। রচনা করেছেন নিজের জীবনী, শুনিয়েছেন প্রাচীন কাহিনী, লিখেছেন শোকগাথা, বিদ্রূপভরা রচনা। তাঁর সব রচনাই নানা দিক দিয়ে অমূল্য। বিদ্যাসাগরই সবার আগে আবিষ্কার করেন বাঙলা গদ্যের ছন্দ। কবিতার যেমন ছন্দ থাকে, তেমনি থাকে গদ্যেরও ছন্দ। এ-কথাটি আমাদের প্রথম দিকের গদ্যশিল্পীরা বুঝতে পারেন নি, তাই তাঁদের গদ্য প্রাণহীন। গদ্য রচনার ভেতরে গোপনে লুকিয়ে থাকে ছন্দ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটি বুঝেছিলেন। তিনি সবার আগে নিয়মিতভাবে ঠিক জায়গাটিতে ব্যবহার করেন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্নগুলো। তাঁর আগের বাঙলা গদ্যে যতিচিহ্ন ছিলো না, থাকলেও তা যথাস্থানে নিয়মিতভাবে ছিল না। বিদ্যাসাগর এগুলোকে গদ্যের ছন্দ রক্ষার জন্যে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন। তাই তাঁর গদ্যরচনা পাঠ করার সময় ঘনঘনভাবে কমার ব্যবহার দেখতে

পাই। তিনি কমা ব্যবহার করেছেন খুব বেশি, কেননা তিনি অনভ্যস্ত পাঠকদের চোখের সামনে গদ্যের ছন্দ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে খুব ভালো কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, বিদ্যাসাগর সবার আগে বাঙলা গদ্যকে মুক্তি দেন সংস্কৃত দীর্ঘ সমাসের কবল থেকে, এবং আবিষ্কার করেন বাঙলা শব্দের সঙ্গীত। তিনি বাঙলা গদ্যকে 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা' থেকে মুক্ত ক'রে ভদ্রসভার উপযোগী ক'রে তোলেন।

বিদ্যাসাগর গদ্যের ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে তাঁর লেখা পড়ার সময় মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলো ধ্বনিময়, গুঞ্জনময়। এজন্যে পরবর্তী কালে অনেক লেখক অনুসরণ করেছেন বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি। সে-গদ্য সুর ছড়ায়, ছবি আঁকে, কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। আবার তিনি যখন হাল্কা বিষয়ে কিছু রচনা করেছেন, তখন তা সরসতায় হয়ে উঠেছে মধুর। বিদ্যাসাগরের সঙ্গীতময় রচনার কিছু অংশ শোনাচ্ছি :

> এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

এ-অংশটুকু নেয়া হয়েছে বিদ্যাসাগরের *সীতার বনবাস* থেকে। উচ্চারণ ক'রে পড়লে সঙ্গীতের মতো শোনাবে।

বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ বইই অনুবাদ। কিছু মৌলিক বইও তিনি লিখেছেন। তাঁর প্রথম বই *বেতালপঞ্চবিংশতি* বের হয়েছিলো ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এটি হিন্দি থেকে অনুবাদ। তাঁর দ্বিতীয় বইয়ের নাম *বাঙ্গলার ইতিহাস* (১৮৪৯)। এটি তিনি রচনা করেছিলেন মার্শম্যানের বই অবলম্বনে। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় বইটিও একটি ইংরেজি বই অবলম্বনে লেখা, বইটি হচ্ছে *জীবনচরিত* (১৮৪৯)। এগুলো ছিলো পাঠ্যবই। তিনি আরো কয়েকটি অনুপম পাঠ্যবই লিখেছেন। তার মধ্যে রয়েছে *বর্ণ-পরিচয়* (১৮৫৪), *কথামালা* (১৮৫৬)। *বর্ণ-পরিচয়* বইটিতে আছে একটি ছন্দময় চরণ; — 'জল পড়ে। পাতা নড়ে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে এ-চরণটি পাঠ ক'রে অভিভূত হয়েছিলেন। বালক কবির মনে হয়েছিলো তখন যেনো তাঁর সকল চেতনায় জল পড়তে এবং পাতা নড়তে লাগলো। এরকম আরো দুটি বই *বোধোদয় (১৮৫১), আখ্যানমঞ্জরী* (১৮৬৩–৬৮)। *আখ্যানমঞ্জরীতে* গল্প বলা হয়েছে সরসভাবে, এর সরসতার তলে লুকিয়ে আছে নীতিকথা।

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি অনন্য বই। এসব বই মূল থেকে অনুবাদ করা সহজ কথা নয়। বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছিলেন কালিদাসের বিখ্যাত বই *শকুন্তলা* (১৮৫৪), বাল্মীকি ও ভবভূতির কাহিনী চয়ন ক'রে লিখেছিলেন *সীতার বনবাস* (১৮৬০)। তিনি শেক্সপিয়রের *কমেডি অফ অ্যাররস* বাঙলায় রূপান্তরিত করেছিলেন *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯) নামে। এই বইগুলোকে শুধু অনুবাদ বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজের কালের মতো ক'রে রচনা করেছিলেন এসব কাহিনী। এগুলো বই থেকে জন্ম নেয়া নতুন বই।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা হচ্ছে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৫৫), *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *ব্রজবিলাস* (১৮৮৫), *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২), *স্বরচিত জীবনচরিত* (১৮৯১)। মৌলিক রচনায় বিদ্যাসাগরকে পাওয়া যায় জীবন্তভাবে; তাঁর নিশ্বাসের প্রবাহ যেনো বোধ করা যায় এগুলোতে। প্রথম পাঁচটি বই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রতিপক্ষের লোকদের আক্রমণ ক'রে। বিদ্যাসাগর জড়িত ছিলেন নানা সংস্কার আন্দোলনে। তিনি বিধবাদের বিবাহ আইনসঙ্গত করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং রহিত করতে চেয়েছিলেন বহুবিবাহ। তাই তাঁর জুটেছিলো অনেক বিরোধী। এদের সাথে তাঁকে নামতে হয়েছিলো নানা তর্কে; বিদ্যাসাগরের এ-পাঁচটি বই তাই তর্কযুদ্ধ। তাঁর যুক্তিগুলো শাণিত, বিদ্রূপভরা। বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপ ছিলো রুচিশীল, তাতে বুদ্ধির ধার ছিলো তীক্ষ্ণ। তিনি এগুলো রচনা করেছিলেন ছদ্মনামে। তিনি *অতি অল্প হইল* এবং *আবার অতি অল্প হইল* রচনা করেছিলেন 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে।

প্রভাবতীসম্ভাষণ এবং *স্বরচিত জীবনচরিত* তাঁর মৌলিক রচনা। এখানে জীবনের শান্ত গম্ভীর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। *প্রভাবতীসম্ভাষণ* একটি শোকগাথা। ছোটো রচনা। এ-রচনায় বিদ্যাসাগরের হৃদয়টি অনাবৃত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর সারাজীবন মানুষকে ভালোবেসেছেন, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জীবনের প্রথম থেকে ছিলেন নাস্তিক; কিন্তু বিশ্বাস করতেন মানুষকে। শেষ জীবনে সেই মানুষের ওপরও তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। বাঙলায় মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা ভীষণ কঠিন! তিনি সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিলো রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবতী নামে আড়াই বছরের একটি শিশুকন্যা। বিদ্যাসাগর এ-শিশুকেই ক'রে নিয়েছিলেন নিজের বন্ধু। কিন্তু প্রভাবতীর মৃত্যু হয় শিশুকালেই। বিদ্যাসাগর শোকে ভেঙে পড়েন। প্রভাবতীকে স্মরণ ক'রে তিনি রচনা করেন বাঙলা ভাষার এক অসাধারণ অশ্রুকাতর রচনা *প্রভাবতী সম্ভাষণ*। সে-করুণ রচনা থেকে বিদ্যাসাগরের বেদনার একটুখানি তুলে আনি:

> বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না, একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

স্বরচিত জীবনচরিত তাঁর আত্মজীবনী। এটি তিনি শেষ ক'রে যান নি। এটিও অমূল্য গ্রন্থ।

বিদ্যাসাগরের সমকালে এবং একটু পরে যাঁরা উৎকৃষ্ট গদ্য লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮১৪–১৮৮৩], দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭–১৯০৫], অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০–১৮৮৬], রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২–১৮৯১], বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮–১৮৯৪], এবং আরো অনেকে। এর আরো পরে আসেন আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিলো গভীর অনুরাগ, ত্যাগ করেছিলেন আস্তিকতা। তিনি ধর্মের নিষ্ফলতা দেখিয়ে লিখেছিলেন একটি বিখ্যাত সমীকরণ। অক্ষয়কুমারের সমীকরণটি হচ্ছে : শ্রম + প্রার্থনা = শস্য, শ্রম = শস্য, সুতরাং প্রার্থনা = ০। শ্রম ছাড়া ধর্মকর্মের ফল শূন্য। সারাদিন ধর্মকর্মেও একটি ধান জন্মানো অসম্ভব। তাঁর গদ্যও ভালো। তাঁর খুব নামকরা বই *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার*। বইটি একটি অনুবাদ বই, এর প্রথমাংশ বের হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে; দ্বিতীয়াংশ বের হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। অক্ষয়কুমার ছিলেন সে-সময়ের বিখ্যাত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো *চারুপাঠ*। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত, বের হয়েছিলো ১৮৫২, ১৮৫৪ এবং ১৮৫৯ সালে। এটি ছিলো সেকালের একটি অবশ্য-পাঠ্য পাঠ্যবই। অক্ষয়কুমারের অন্য দুটি বই *ধর্মনীতি* (১৮৫৬), *ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়* (১৮৭০)। অক্ষয়কুমার বাঙলা গদ্যকে জ্ঞানচর্চার উপযোগী ক'রে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট কাব্যময় গদ্যলেখক। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *আত্মতত্ত্ববিদ্যা* (১৮৫২), *ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা* (১৮৬২), *স্বরচিত জীবনচরিত* (১৮৯৪)। তাঁর জীবনচরিত মহৎ বই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন বিখ্যাত পত্রিকা *বিবিধার্থ সংগ্রহ*-এর (১৮৫১) সম্পাদক। তিনি এ-পত্রিকায় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসমালোচনার এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে আছে *প্রাকৃত ভূগোল* (১৮৫৪), *শিল্পিক দর্শন* (১৮৬০), *পত্রকৌমুদী* (১৮৬৩)। এ-সময়ের দুজন বিখ্যাত গদ্যলেখক রাজনারায়ণ বসু [১৮২৬–১৮৯৯], ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭–১৮৯৪]। রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ *সেকাল আর একাল* [১৮৭৪], *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা* (১৮৭৮)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ *পারিবারিক প্রবন্ধ* (১৮৮২), *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২)।

বাঙলা গদ্যের ভুবনে এক তুমুল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তাঁর ছদ্মনাম ছিলো টেকচাঁদ ঠাকুর। তিনি হৈচৈ বাধিয়েছিলেন বেশ। এতোদিন আমরা যে-গদ্য দেখেছি, তা হচ্ছে সাধু গদ্য। তাতে সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো। প্যারীচাঁদ ১৮৫৪ সালে তাঁর এক বন্ধুর সাথে প্রতিষ্ঠা করেন একটি পত্রিকা; নাম *মাসিক পত্রিকা*। তিনি ঘোষণা করেন সাধু গদ্য চলবে না, চলবে না সংস্কৃত শব্দ। বাঙলা ভাষাকে করতে হবে সত্যিকারে বাঙলা ভাষা। তিনি সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন কথ্যরীতিতে, সাধুরীতিতে নয়। যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, প্যারীচাঁদ সে-ভাষা ব্যবহার করতে চান সাহিত্যে। এ-ভাষা হবে মুখের ভাষার অনুরূপ। দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি নিজেই। লেখেন একটি উপন্যাস, প্রকাশ করতে থাকেন *সাহিত্য পত্রিকায়*। তাঁর এ-বইটির নাম *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮)। প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা গদ্যের রূপ বদলাতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নতুন গদ্য। আজকাল আমরা যে-চলতি গদ্য লিখি, তাই চেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। তাই তাঁর লেখায়, *আলালের ঘরের দুলাল*-এ তিনি ব্যবহার করেন চলতি ক্রিয়াপদ, ব্যবহার করেন বেশি পরিমাণে খাঁটি বাঙলা শব্দ। তিনি ভাষাকে চলতি ভাষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সফল হন নি। তাঁর গদ্য না চলতি, না সাধু। সাধু-চলতি-আঞ্চলিক সব রকমের ভাষা মিশিয়ে এক নতুন গদ্য তৈরি করেন তিনি। এ-ভাষারীতি তিনি কাজে লাগিয়েছেন মাত্র *আলালের ঘরের দুলাল*-এ। তিনি রচনা করেছিলেন

আরো অনেক বই, সেগুলো সবই বিদ্যাসাগরের মতো সাধু গদ্যে রচিত। তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* বই আকারে প্রথম বের হয় ১৮৫৮ অব্দে। তাঁর অন্যান্য বই হচ্ছে *মদ খাওয়ার বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* (১৮৫৯), *রামারঞ্জিকা* (১৮৬০), *যৎকিঞ্চিৎ* (১৮৬৫), *ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত* (১৮৭৮), *বামাতোষিণী* (১৮৮১)। প্যারীচাঁদের বিদ্রোহের পথ ধ'রে বাঙলা গদ্যের জগতে আসেন আরেক বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৪০–১৮৭০]। তিনি চলতি গদ্যে লেখেন একটি অনন্য বই, যার নাম *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২)। তাঁর এ-বইটি আলোড়ন জাগিয়েছিলো নানা কারণে, এর একটি বড়ো কারণ এর চলতি গদ্য। তাঁরা দুজন বাঙলা ভাষায় চলতি গদ্যের অগ্রপথিক।

এরপর আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক আমাদের সাহিত্যের এবং শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের একজন। তিনি বাঙলা গদ্যকে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত করেছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত সকল গদ্য লেখকদের সাধনা যেনো চরম সফলতা হয়ে দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। তাঁর সম্বন্ধে বেশি বলবো না। একটি পুরো বই তো লেখা দরকার তাঁকে নিয়ে। বঙ্কিম বাঙালির সৃষ্টিশীলতা ও মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

গদ্য বিকশিত হয়, অভাবিত সৃষ্টিশীল হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে-গদ্যকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলেন গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গেও বেশি বলার দরকার নেই। তবে একটু বলা দরকার আরেকজন সম্বন্ধে; তাঁর নাম প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮–১৯৪৬]। আমরা আজ যে সব কাজে চলতি গদ্য ব্যবহার করি, তা প্রমথ চৌধুরীরই জন্যে। তিনি সাহিত্যে এসেছিলেন চলতি গদ্যরীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই। তাতে তিনি সার্থক হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেকদিন চলতি গদ্য লেখেন নি, শেষ জীবনে লেখা শুরু করেন। এর মূলে আছেন প্রমথ চৌধুরী।

কবিতা : অন্তর হ'তে আহরি বচন

উনিশশতকের প্রথমার্ধ ভ'রে চলে গদ্যের রাজত্ব; সবদিকে কেবল গদ্যের পতাকা উড়তে থাকে। সে-সময়ে গদ্যই সম্রাট। যেদিকে তাকাই গদ্য আর গদ্য; গদ্যের মহাসমুদ্রে অবিরাম ঢেউ উঠছে আর ভেঙে পড়ছে। এ-সময়ে চলছিলো কবিতার আকাল। কোনো ফসলই ফলছিলো না কবিতার। বাঙলাদেশে এমনটি আর দেখা যায় নি। যদি কবিতাই না থাকে, তবে থাকলো কী বাঙলা সাহিত্যের! বাঙলা সাহিত্যের দেবী চিরকাল কাব্যজীবী, কবিতার স্বাদ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। কিন্তু উনিশশতকের প্রথমার্ধে সে-দেবীই হয়ে ওঠে গদ্যমুখর, যা বলে সব বলে গদ্যে। তার কণ্ঠে সুর নেই, গান নেই, ছন্দ নেই। ওই সময়টা কর্মীদের কাল। দশকেদশকে জন্ম নিচ্ছিলেন কর্মীরা; আর গদ্য ছিলো তাঁদের কর্মের হাতিয়ার। তখনো বাঙলার স্বাপ্নিকেরা জন্ম নেন নি। ওটা স্বপ্নের সময় ছিলো না। ওই স্বপ্নহীন সময়ের একমাত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮২২–১৮৫৯]। তাঁর চোখেও স্বপ্ন ছিলো না; ছিলো বাস্তব জগৎ, আর বাস্তবের সংবাদ। তিনি ছিলেন "সম্বাদ প্রভাকর"-এর বিখ্যাত সম্পাদক। তিনি ছিলেন পুরোনো রীতির কবি। যাকে বলে আধুনিকতা, তা তাঁর

কবিতায় ফোটে নি, কেবল আধুনিক বাতাস এসে লেগেছিলো তাঁর কবিতার শরীরে ও মনে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনিই উনিশশতকের প্রথমার্ধের একমাত্র কবি আমাদের। তাঁর কবিতা ছিলো হাল্কা, ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা। তাঁর কবিতায় কল্পনার স্থানও ছিলো না। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন আধুনিক কালের মানুষ। কিন্তু তিনি আধুনিকতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এ-কবির দৃষ্টিও ছিলো একটু বাঁকা; তিনি সবকিছু দেখতেন বাঁকা চোখে, আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভ'রে তুলতেন কবিতা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিষয়ও ছিলো চমৎকার; — তপসে মাছ থেকে শুরু করে ইংরেজদের ককটেল পার্টি সবকিছু ছিলো তাঁর কবিতার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বলেছেন 'খাঁটি বাঙালি'। আধুনিক কালে অবশ্য 'খাঁটি বাঙালি' হওয়া খুব প্রশংসার ব্যাপার নয়। তাঁর কবিতায় আগের কালের কবিওয়ালাদের প্রভাব বেশ গভীর।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। তা হলো কবির হাস্যরসিকতা। তিনি সবকিছু থেকে হাস্যরস আহরণ করেন, দুঃখের মধ্যেও তাঁর হাসি থামে না। তাঁর একটি বড়ো দুঃখের কবিতা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। কবিতাটির নাম "পৌষপার্বণ"। কবি বড়ো দুঃখের কথা বলেছেন :

এবার বছরকার দিন, কপালে ভাই,
জুটলো নাকো, পুলি পিঠে।
যে মাগগির বাজার, হাজার হাজার,
মোর্তেছে লোক, কপাল পিটে ॥

কবি কিন্তু খুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর একটি কবিতায় এক ইংরেজ রমণীর। তিনি লিখেছেন :

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কতো রোজ ফোটে ॥

উনিশশতকের প্রথমার্ধের শেষদিকে দেখা দেন আরেকজন কবি। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে কিছুটা আধুনিক; কিছুটা নয়, অনেকটা। তবে তিনি খাঁটি কবি ছিলেন না। তাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর *পদ্মিনী-উপাখ্যান* নামক একটি আখ্যায়িকা কাব্য বের হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটিতে আছে অনেক ঘটনা, অনেক উপমা। তিনি কাব্যের কাহিনী আহরণ করেছিলেন টডের *রাজস্থান-কাহিনী* নামক একটি বই থেকে। এ-কাব্যটিতেই আছে সেই বিখ্যাত চরণগুলো—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?' তবে *পদ্মিনী-উপাখ্যান* আধুনিক কবিতাকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারে নি। এ-কবির আরো কয়েকটি কাব্য হচ্ছে *কর্মদেবী* (১৮৬২), *শূরসুন্দরী* (১৮৬৮), *কাঞ্চীকাবেরী* (১৯৭৯)।

বাঙলা কবিতায় আধুনিকতা আনেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪–১৮৭৩]। শুধু কবিতায় নয়, তিনি আধুনিকতা আনেন নাটকে, প্রহসনে। তাঁর মতো প্রতিভাবান কবি বাঙলা সাহিত্যে আছেন মাত্র আর একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করে

বাঙলা কবিতার রূপ বদলে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা রঙ্গলালের পর তাঁর আগমন অনেকটা আকস্মিক। তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন মাত্র কয়েক বছর, ধূমকেতুর মতো তিনি চোখ ধাঁধিয়ে এসেছেন, কতোগুলো সোনার ফসল ফলিয়েছেন, এবং হঠাৎ বিদায় নিয়েছেন। বাল্যকালে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন নি। কবি মধুসূদনের জীবন একটি বিয়োগান্তক নাটকের চেয়েও বেশি শিহরণময়, বেশি করুণ। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাধ ছিলো বড়ো কবি হওয়ার; তবে বাঙলা ভাষার নয়, ইংরেজি ভাষার। ইংরেজি তিনি শিখেছিলেন ইংরেজের মতো, কবিতাও লিখেছিলেন ইংরেজিতে। ধর্ম বদলে হয়েছিলেন খ্রিস্টান, নাম নিয়েছিলেন মাইকেল। বিয়ে করেছেন দুবার, দুবারই বিদেশিনী। আবাল্য তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, হিশেব করা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অনেক টাকা, কিন্তু তাঁর জীবন সমাপ্ত হয়েছে দারিদ্র্যে। সব মিলে মধুসূদন তুলনাহীন। বিলেত যাওয়ার জন্যে তিনি ছিলেন পাগল। একটি ইংরেজি কবিতায় তাঁর আবেগ তীব্রভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, 'আই শাই ফর অ্যালবিঅনস ডিসট্যান্ট শোর', অর্থাৎ 'শ্বেতদ্বীপ তরে পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস।' তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন দুটি দীর্ঘ কাব্য; একটির নাম *ক্যাপটিভ লেডি*, অপরটির নাম *ভিশনস অফ দি পাস্ট*। *কিন্তু* মধুসূদন বুঝেছিলেন তিনি যে-অমরতা কামনা করেন, তা লাভ করা যাবে না ইংরেজিতে লিখে। তাই তিনি হঠাৎ আসেন বাঙলা কবিতার ভুবনে। তিনি আসেন, দেখেন, জয় করেন। একটি চতুর্দশপদী বা সনেটে মধুসূদন বাঙলা কবিতার রাজ্যে আসার কথা বলেছেন। তার কিছু অংশ :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন —
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।

কবি মধুসূদন বাঙলা কবিতার ভুবনে আসেন ১৮৫৯ অব্দে *তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য* নামে একটি চার-সর্গের আখ্যায়িকা কাব্য নিয়ে। কাব্যটি বাঙলা কবিতার রাজ্যে নতুন। ভাব ভাষা প্রকাশরীতি সবদিকেই। তবু এটি মধুসূদনের প্রতিভার পরিচায়ক নয়। তাঁর প্রধান এবং বাঙলা কবিতার অন্যতম প্রধান কাব্য *মেঘনাদবধকাব্য*। প্রকাশিত হয় ১৮৬১ অব্দে। এ-কাব্য প্রকাশের সাথেসাথে স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে তিনি বাঙলার মহাকবিদের একজন। এটি একটি মহাকাব্য। নয় সর্গে রচিত এ-কাব্যের নায়ক রাবণ। মধুসূদন নতুন কালের বিদ্রোহী; তিনি চিরকাল দণ্ডিত রাবণকে তাই ক'রে তোলেন তাঁর নায়ক। রাম সেখানে সামান্য। রাবণের মধ্য দিয়ে মধুসূদন তোলেন তাঁর সমকালের বেদনা দুঃখ আর ট্র্যাজেডি। মধুসূদন তার কাব্যের কাহিনী নিয়েছিলেন রামায়ণ থেকে; সীতা হরণ এবং রাবণের পতন এ-কাব্যের বিষয়। কিন্তু তাঁর হাতে এ-কাহিনী লাভ করে নতুন তাৎপর্য। হয়ে ওঠে অভিনব মহাকাব্য, বাঙলা ভাষায় যার কোনো তুলনা নেই।

এ-কাব্যে তিনি আর যা মহৎ কাজ করেন, তা হচ্ছে ছন্দের বিস্তৃতি। তিনি চিরদিনের বাঙলা পয়ারকে নতুন রূপ দেন। আগে পয়ার ছিলো বহুব্যবহারক্লান্ত ছন্দোরীতি। মধুসূদন

পয়ারকে প্রচলিত আকৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে ক'রে তোলেন প্রবহমাণ। একে অনেকে বলেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। পয়ার এমন :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান ॥

আগে কবিরা চোদ্দ মাত্রার প্রতিটি চরণের শেষে এসে থেমে পড়তেন। প্রথম চরণের শেষে দিতেন এক দাঁড়ি, দ্বিতীয় চরণের শেষে দু-দাঁড়ি। এ-ভাবে শ্লথগতিতে কাব্য এগিয়ে চলতো। কবিরা তখন ছিলেন ছন্দের দাস, যা তাঁরা বলতে চাইতেন পারতেন না বলতে; কেননা প্রতি চরণের শেষে তাঁদের জিরোতে হতো। কবি মধুসূদন ছন্দের এ-শৃঙ্খলটাকে ভেঙে ফেলেন। তিনি ছন্দকে করেন কবির বক্তব্যের অনুগামী। উদাহরণ দিলে বোঝা সহজ হবে :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

পংক্তিগুলো পাওয়া যাবে *মেঘনাদবধকাব্য*-এর শুরুতেই। এখানে প্রতি চরণে চোদ্দ মাত্রা ঠিকই আছে, কিন্তু প্রতি চরণে বক্তব্য না থেমে থেমেছে সেখানে, যেখানে শেষ হয়েছে বক্তব্য। এটি ছন্দের ক্ষেত্রে একটি বিশাল ঘটনা। মধুসূদন মুক্তি দেন বাঙলা ছন্দকে; পয়ারকে ক'রে তোলেন প্রবহমাণ। একে নির্ভর ক'রে অনেক বিবর্তন ঘটেছে বাঙলা ছন্দের।

তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য এবং *মেঘনাদবধকাব্য* ছাড়া মধুসূদন আরো লিখেছেন *ব্রজাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬১), *বীরাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬২), এবং *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৬)। "ব্রজাঙ্গনা" রাধার বিরহ নিয়ে রচিত কাব্য। এ-কাব্যে আছে কিছু চমৎকার লিরিক বা গীতিকবিতা। তার একটি অংশ :

কেন এতো ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

মধুসূদনের *বীরাঙ্গণা* এক অসাধারণ অভিনব কাব্য। বাঙলা ভাষায় মধুসূদন সর্বপ্রথম রচনা করেন সনেট, তিনি যার নাম দিয়েছিলেন "চতুর্দশপদী কবিতা"। ১৮৬০ সালে তিনি প্রথম সনেট লেখার কথা ভাবেন, এবং একটি সনেট রচনাও করেন। এটিই পরে পুনর্লিখিত হয়ে নাম পায় 'বঙ্গভাষা'। মধুসূদন সনেট লিখেছিলেন ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে ব'সে। তখন তিনি ছিলেন পরবাসী, দারিদ্র্যপীড়িত। তাই এ-সনেটগুলোতে তাঁর মনের

আবেগ, অনুভূতি, বেদনা থরেথরে প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনকে আমরা জানি অলঙ্কারশোভিত ঘনঘটাময় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কবি ব'লে। তাঁর ছিলো একটি অতি সকাতর চিত্ত, যা সাধারণত থাকে রোমান্টিক কবিদের। মধুসূদন বাঙলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে নিয়ে আসেন আধুনিক কালে। সৃষ্টি করেন অমর কবিতা।

মধুসূদনের পরে বাঙলা কবিতায় দেখা দেয় অনুকৃতি, বৈচিত্র্যহীনতা। মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেছেন, তাই তাঁর পরে অনেকে চেষ্টা করেন মহাকাব্য লিখে মহাকবি হ'তে। এর ফলে বাঙলা কবিতায় দেখা দেয় এক শ্রেণীর দীর্ঘ আখ্যায়িকা কাব্য, যেগুলো দেখতে মহাকাব্যের মতো, কিন্তু মহাকাব্য নয়। মহাকাব্য প্রতিবছর রচনা করা যায় না; মহাকাব্য রচিত হ'তে পারে কয়েকশো বছরে একটি। এছাড়া আধুনিক কাল মহাকাব্যের কালও নয়। মধুসূদনপরবর্তী কবিরা এ-কথাটি বুঝতে পারেন নি। বা পারলেও তাঁদের ক্ষমতা ছিলো না কবিতার দিক বদল করতে। তাই তাঁরা আপ্রাণ অনুসরণ করেন মধুসূদনকে। দেখতে মহাকাব্যের মতো, কিন্তু আসলে তা নয়, এরকম কাব্য লেখেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮–১৯০৩], নবীনচন্দ্র সেন [১৮৪৭-১৯০৯], কায়কোবাদ [১৮৫৭–১৯৫১], এবং আরো অনেকে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন *বীরবাহুকাব্য* (১৮৬৪), *বৃত্রসংহার* (১৮৭৫–১৮৭৭)। তাঁর কিছু খণ্ডকবিতাও আছে। নবীনচন্দ্র সেন লেখেন *পলাশির যুদ্ধ* (১৮৬৬), *ক্লিওপেট্রা* (১৮৭৭), *রঙ্গমতী* (১৮৮০) এবং *রৈবতক* (১৮৮৬), *কুরুক্ষেত্র* (১৮৯৩), *প্রভাস* (১৮৯৬)। তিনি কিছু ক্ষুদ্র কবিতাও রচনা করেছিলেন, সেগুলো সংগৃহীত হয়েছিলো *অবকাশরঞ্জিনী* (১৮৭১) নামক কাব্যে। কায়কোবাদ মহাকবি হওয়ার জন্যে লিখেছিলেন মহাকাব্য, যদিও তাঁর মনটি ছিলো গীতিকবির। তিনি ছিলেন আবেগী, গীতিকবিতার চর্চা করলে তিনি আরো কবি হ'তে পারতেন। তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে রচনা করেন *মহাশ্মশান কাব্য* (১৯০৪)। তাঁর অন্যান্য কাহিনীকাব্য হচ্ছে *মহরম শরিফ কাব্য* (১৯৩২), *শিবমন্দির* (১৯৩৮)। তাঁর খণ্ডকবিতার বই *বিরহবিলাপ* (১৮৭০), *অশ্রুমালা* (১৮৯৫)। এ-সময়ে আর যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয় চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙলা কবিতায় যখন মহাকাব্যের ঘনঘটা চলছিলো, তখন এক লাজুক নির্জন কবি নিজের মনের কথা নিজের সুরে ধ্বনিত করেন। কবি নিজের আবেগে বিভোর, তাঁর চারদিকে কী আছে সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি বাস করছেন নিজের অন্তরঙ্গলোকে; তিনি কারো উদ্দেশে কিছু বলেন না, শুধু গুণগুণ করেন নিজেকে নিজের কাছে। এ-কবির মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দেয় রোম্যান্টিকতা, যা একদিন বাঙলা কবিতাকে অধিকার ক'রে নেয়। এ-কবির নাম বিহারীলাল চক্রবর্তী [১৮৩৫–১৮৯৪]। যে-কবি নিজের মনের কথা বলেন, যে-কবি অদ্ভুতকে, সুন্দরকে, রহস্যকে আহ্বান করেন, যে-কবি যা পান না বা পাবেন না, তা চেয়েচেয়ে জীবন কাটান, তিনি রোম্যান্টিক কবি। বিহারীলাল বাঙলা কবিতার প্রথম রোম্যান্টিক কবি, প্রথম খাঁটি আধুনিক কবি। তাঁর পথ ধ'রে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাঙলা কাব্যের 'ভোরের পাখি'। ভোরের পাখি সূর্যোদয়ের আগে একাকী জাগে, মনের আনন্দে গান গায়, সূর্য ওঠার পর সে আর থাকে না। বিহারীলালও তেমনি, একাকী নিজের মনের গীতিকা সুরে বেঁধেছিলেন তিনি; তবে ভোর হওয়ার পরও তিনি আছেন। বিহারীলালের কবিতা পড়লে মনে হয় কবি বাস করছেন দিগদিগন্তব্যাপী। আবেগের কাতরতার মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে। ওই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি

স্বপ্নলোকের অধিবাসী, বাস্তবতা তাঁর অচেনা। তিনি বাঙলা কবিতার প্রথম খাপ-না-খাওয়া কবি। তিনি একটি নতুন—রোম্যান্টিক—ধারার প্রবর্তক হিশেবে চিরস্মরণীয়। বিহারীলালের মধ্যে রোমান্টিক আবেগের প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু নেই সে আবেগকে রূপ দেয়ার শক্তি। এ-আবেগকে পরে রূপ দিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলালের শিষ্য। বিহারীলাল এমন কিছু স্তবক ও পংক্তি লিখে গেছেন, যেগুলো বাঙলা কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিহারীলালের কবিতার বই আছে অনেকগুলো : *সঙ্গীতশতক* (১৮৬২), *প্রেমপ্রবাহিণী* (১৮৭০), *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০), *নিসর্গ সন্দর্শন* (১৮৭০), *সারদামঙ্গল* (১২৮৬), *সাধের আসন*। এর মধ্যে যে-দুটি বই বিহারীলালের খ্যাতির কারণ, সেদুটি *বঙ্গসুন্দরী* এবং *সারদামঙ্গল*। *বঙ্গসুন্দরী* কাব্যে বিহারীলাল সর্বপ্রথম রোম্যান্টিক হাহাকার নিয়ে সবার সামনে উপস্থিত হন। এ-হাহাকার তীব্র, কবির আবেগে পাঠকও ভেসে যায়। অকারণ বেদনা হচ্ছে রোম্যান্টিক কবিতার একটি বড়ো লক্ষণ। কবি বেশ সুখে আছেন তবু সুখ পাচ্ছেন না, কেনো তিনি অসুখী তা তিনি নিজেও জানেন না। বিহারীলালের কবিতা থেকে তেমন চরণ তুলে আনি :

সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

কবির এ-জ্বালার কোনো কারণ নেই, তাইতো এ-জ্বালা অসহ্য। কবি বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম *সারদামঙ্গল*। এ-কাব্যে তাঁর রোম্যান্টিক আকুলতা চরণেচরণে প্রকাশ পেয়েছে, যদিও সর্বত্র তা রূপ পায় নি। কবি এ-কাব্যে এতো রকমের স্বপ্ন দেখেছেন, এতো রকমের আবেগ প্রকাশ করেছেন যে কাব্যটি প'ড়ে বুঝতে কষ্ট হয় কবি কী বললেন। মনের আবেগে তিনি চরণের পরে চরণ রচনা করেছেন, একবারও ভাবেন নি পাঠকদের কথা। তবে কাব্যটির আছে ভালোভালো গীতিকবিতা, পাঠকের জন্যে ওইটুকু কম লাভ নয়। বিহারীলালের মধ্যে একজন বড়ো কবি বাস করতেন, কিন্তু সে-কবি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি। আবেগের ঘনমেঘে সে চিরদিন অদৃশ্য রয়েছে। বিহারীলাল বাঙলা ভাষার বিশুদ্ধ কবিদের একজন।

বিহারীলালের অন্তরঙ্গ কবিতার পথ ধ'রে এসেছিলেন অনেক কবি। তাঁদের কয়েকজন : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার [১৮৩৮–১৮৭৮], দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০–১৯২৬], দেবেন্দ্রনাথ সেন [১৮৫৮–১৯২০], গোবিন্দচন্দ্র দাস [১৮৫৫–১৯১৮], অক্ষয়কুমার বড়াল [১৮৬০–১৯১৯], দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩–১৯১৩], এবং রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১–১৯৪১]। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের নাম *মহিলা*, দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের নাম *স্বপ্নপ্রয়াণ*, গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যের নাম *প্রেম ও ফুল*, *শোকোচ্ছ্বাস*, *মগের মুলুক*। তিনি প্রতিবাদী কবি ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যের নাম *ফুলবালা*, *অশোকগুচ্ছ*, *গোলাপগুচ্ছ*, *পারিজাতগুচ্ছ*, *শেফালিগুচ্ছ*। অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের নাম *এষা*। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যের নাম *আর্যগাথা*, *আষাঢ়ে*, *হাসির গান*, *মন্দ্র*, *আলেখ্য*।

উপন্যাস : মানুষের মহাকাব্য

উপন্যাস মানুষের কাহিনী; সাধারণ মানুষের কাহিনী। চারপাশের বাস্তব মানুষের গল্প। আগে সাহিত্য রচিত হতো দেবতাদের নিয়ে, পরীদের নিয়ে, তাদের নিয়ে যারা অসাধারণ। মানুষের জীবনে গল্প আছে, এবং তা শোনার মতো, একথা মনে হয় নি মানুষের শতোশতো বছরে। আধুনিককালে এক সময় মানুষ আবিষ্কার করে যে তারই মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বেশি গল্প। তার ঘরে, তার মনে, তার চারদিকে, তাকে ঘিরে আছে গল্প, এবং তা শোনার মতো, বলার মতো। এ-চেতনা থেকে সৃষ্টি হয় উপন্যাস আধুনিক কালে। উপন্যাস তাই আধুনিক কালের ফসল। মানুষ সহজে মানুষকে চিনতে পারে না, তাই উপন্যাস নিয়ে বিপদ অনেক। মানুষ প্রথম উপন্যাস রচনা করতে এসে বেছে নেয় মানুষের মধ্যে যারা বড়ো, তাদের। আজকাল এ-বিষয়েও বদল ঘটেছে। আজ উপন্যাসে অতি সাধারণ মানুষের আধিপত্য। উপন্যাস সাধারণ মানুষের মহাকাব্য।

উপন্যাস একদিকে বেশ সহজ শিল্পকর্ম, আবার অন্যদিকে বেশ জটিল। একজন মানুষের জীবনের সব ঘটনা লিখে ফেললে তা উপন্যাস হবে। কিন্তু উপন্যাসকে এতো সহজ ভাবলে বিপদ অনেক। উপন্যাস হয় আকারে বড়ো, আর সাদরে গ্রহণ করে জীবনের সবকিছু। কিছুই পরিত্যাগ করে না, কাউকে বলে না আমার মধ্যে তোমার স্থান নেই। তাই উপন্যাসের লেখকের জানতে হয় তিনি জীবনের এতো ধনের মধ্যে কোনটুকু নেবেন বেছে আর কোনটুকু করবেন পরিত্যাগ।

বাঙলা সাহিত্যে, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের মতোই, উপন্যাস এসেছে বেশ পরে; উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে। প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*কে (১৮৫৮) বাঙলা ভাষার প্রথম উপন্যাস বলা হয়। আবার কেউ বলেন, এটি প্রথম উপন্যাস নয়, প্রথম উপন্যাস এক বিদেশিনীর লেখা। তাঁর নাম হেনা ক্যাথেরিন ম্যুলেনস। তাঁর বইয়ের নাম *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*। বইটি বেরিয়েছিলো ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। বইটিতে কিন্তু লেখিকা মানুষের গল্প শোনাতে চান নি, চেয়েছিলেন খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত এক বাঙালি পরিবারের ছবি এঁকেছেন এ-বইতে, দেখাতে চেয়েছেন জিশুতে যার আস্থা গভীর, সে সুখে থাকে এবং যার আস্থা নেই, সে থাকে কষ্টে। বইটিতে উপন্যাসের গুণ নেই বললেই চলে, তাই এটিকে প্রথম উপন্যাস বলা যায় না। অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"ই বাঙলা ভাষার প্রথম উপন্যাস।

প্যারীচাঁদ তাঁর মাসিক পত্রিকায় *আলালের ঘরের দুলাল* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। বই আকারে এটি মুদ্রিত হয় ১৮৫৮ অব্দে। এ-কাহিনীর নায়ক মতিলাল। সে এক ধনী পিতার সন্তান, আদরে আদরে সে যায় নষ্ট হয়ে। এ-হচ্ছে *আলাল*-এর কাহিনী। তবে এটিকে নির্দোষ উপন্যাস বলা যায় না। উপন্যাসে আমরা যে-নিটোল কাহিনী, চিন্তার গভীরতা আশা করি তা এটিতে নেই। উপন্যাসের চরিত্রগুলোও ভালোভাবে ফোটে নি। এটিকে বলা যায় উপন্যাসের খসড়া। এ-উপন্যাসে একটি মজার চরিত্র আছে, তার নাম ঠকচাচা। ঠকচাচার ক্রিয়াকলাপ বেশ উপভোগ্য।

বাঙলা সাহিত্যে যিনি প্রথম সত্যিকার উপন্যাস রচনা করেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮–১৮৯৪]। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হুগলি জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি কর্মচারী।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্র ভালো ছিলেন। তিনি ভারতের সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি বিএ পাশ করেন ১৮৫৮ সালে, দ্বিতীয় বিভাগে। ওই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মতো বিএ পরীক্ষা গ্রহণ করে। মোট তেরোজন ছাত্র অংশ নেয় পরীক্ষায়। সে-বছর প্রশ্ন হয়েছিলো অত্যন্ত কঠিন। তাই কেউ পাশ করতে পারেন নি। তাই সাত নম্বর গ্রেস দেয়া হয়। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হয়ে বিএ পাশ করেন। তিনি যোগ দেন সরকারি চাকুরিতে এবং সারা জীবন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর চোদ্দটি উপন্যাসের জন্যে। উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি। সবই অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তাঁর সীমাবদ্ধতা একটিই, তা হচ্ছে তাঁর রক্ষণশীলতা। তাঁর প্রতিভা উপকারী হয়েছে, আর তাঁর রক্ষণশীলতা হয়েছে ক্ষতিকর।

বঙ্কিম প্রথম লিখেছিলেন একটি ইংরেজি উপন্যাস, নাম *রাজমোহনস ওয়াইফ* বা রাজমোহনের স্ত্রী। অবিলম্বে তিনি ইংরেজি ছেড়ে বাঙলায় লেখা শুরু করেন। ১৮৬৫ সাল বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ওই বছরের মার্চ মাসে বেরোয় বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী*। এটি প্রকাশের সাথে সাথে আলোড়ন জাগে সাহিত্য জগতে; কেননা এ ছিলো অভূতপূর্ব। ভাব-ভাষা-কাহিনী সবদিকে এটি অভিনব। ইতিহাস আর কল্পনা মিলিয়ে সুখকর মুগ্ধকর এক কাহিনী উপহার দেন তিনি। বাঙলা সাহিত্যে তখন প্রবাহিত হলো নতুন বাতাস। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলো কিন্তু সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুষের গল্প নয়, তিনি ইতিহাস এবং কল্পনা মিশিয়ে রচনা করেছেন তাঁর গল্প। যখন তিনি সমকালের মানুষের কথা লিখেছেন, তখনও তা সাধারণ মানুষের কাহিনী নয়, তা জমিদার শ্রেণীর লোকের গল্প। কিন্তু তাতে কী, বঙ্কিমের রচনা জীবনের সকল প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছে।

তিনি ইতিহাস আর কল্পনা মিলিয়ে মিশিয়ে যে-সব উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো হচ্ছে *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *সীতারাম* (১৮৮৭), *দেবীচৌধুরাণী* (১৮৮৪)। সমকালের জীবন নিয়ে তিনি রচনা করেন *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *রজনী* (১৮৭৭), *রাধারাণী* (১৮৭৭)।

বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রবেশ করলে মনে হয় এক বিপুল বিশ্বে এলাম। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পাত্রপাত্রী রাজা, মহারাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, সেনাপতি ও সৈন্য। কিছু উপন্যাসে রয়েছে সমাজের উঁচুতলার অধিবাসীরা। তিনি যে-ভাবে গ'ড়ে তোলেন কাহিনী, তাতে আমরা মোহিত হই; তিনি যে-ভাবে মানুষের অন্তর উন্মোচিত ক'রে দেখিয়ে দেন তার বেদনামথিত হৃদয়, তাতে আমরা শিহরিত হই। অনেকে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন রোমান্স, একথা হয়তো মিথ্যে নয়; কেননা বাস্তব জগতের ছবি, আমাদের দেখা প্রতিবেশের জীবন তিনি রচনা করেন নি। তাঁর গল্পে আসে গড়মন্দারণের রাজকন্যা তিলোত্তমা, আসে নুরজাহান, আসে আওরঙ্গজেব, আসে রাজসিংহ, আসে রাজকন্যা জেবুন্নেসা। এরা আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় বিশাল আকারে। কিন্তু বঙ্কিম দেখিয়ে দেন এদের যতো বড়োই মনে হোক-না-কেনো আসলে এরা মানুষ, এবং এদের সকলের বুক ভ'রে আছে নীল বেদনায়। এজন্যে রাজকন্যা, নিষ্ঠুর রাজকন্যা হাহাকার ক'রে কাঁদে, মেহেরুন্নিসা একথা ভেবে সান্ত্বনা পায় যে তার অপরূপ মুখের ছাপ থাকবে কবরের মাটিতে। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাস ট্র্যাজেডি। মানুষের মিলনের চেয়ে তিনি বড়ো ক'রে

তুলেছেন দুঃখকে। সমকালের মানুষ নিয়ে লেখা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস *বিষবৃক্ষ* এবং *কৃষ্ণকান্তের উইল* বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর দুটি।

তাঁর সমকালে আর যাঁরা উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৭–১৮৯৪], গোপীমোহন ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ [১৮৪০–১৯২১], তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [১৮৪৩–১৮৯১], সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪–১৮৮৯], রমেশচন্দ্র দত্ত [১৮৪৮–১৯০৯], স্বর্ণকুমারী দেবী [১৮৫৫–১৯৩২], মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭–১৯২২], শিবনাথ শাস্ত্রী [১৮৪৭–১৯১৯], শ্রীশচন্দ্র মজুমদার [১৮৬০–১৯০৮], ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯–১৯১১], ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৭–১৯১৯], এবং আরো অনেকে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাম *ঐতিহাসিক উপন্যাস* (১৮৫৭)। এতে আছে দুটি কাহিনী; —'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। গোপীমোহন ঘোষের উপন্যাস *বিজয়বসন্ত* (১৮৬৩)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস *বঙ্গাধিপ পরাজয়* (১৮৬৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪), সঞ্জীবচন্দ্রের উপন্যাস *কণ্ঠমালা* (১৮৭৭), *মাধবীলতা* (১৮৮৪)। রমেশচন্দ্র দত্ত খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁর উপন্যাস *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪), *মাধবীকঙ্কন* (১৮৭৭), *জীবন প্রভাত* (১৮৭৮), *জীবন সন্ধ্যা* (১৮৭৯)। এ-চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস; এ-চারটিরই ঘটনা ঘটেছে মুঘল শাসনের একশো বছরের মধ্যে। এ-জন্যে এ-চারটি একসাথে সংকলিত হয়েছিলো *শতবর্ষ* (১৮৭৯) নামে। রমেশচন্দ্র রচনা করেছিলেন দুটি সামাজিক উপন্যাস *সমাজ* (১৮৯৪) ও *সংসার* (১৮৮৬) নামে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়ো বোন। তাঁর উপন্যাসগুলো হচ্ছে *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৬), *হুগলির ইমামবাড়ি* (১৮৯৪), *কাহাকে* (১৮৭৮), *বিদ্রোহ* (১৮৯০), *মিবাররাজ, ফুলের মালা* (১৮৯৪), *মিলন রাত্রি* (১৯২৫)। মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাসের নাম *বিষাদ সিন্ধু* (১৮৮৫–৯০), *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০), শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসের নাম *মেজ বৌ* (১৮৭৯), *যুগান্তর* (১৮৯৫), *নয়নতারা* (১৮৯৯); শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাসের নাম *শক্তিকানন* (১৮৮৭), *ফুলজানি* (১৮৯৪), *কৃতজ্ঞতা* (১৮৯৬); ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাম *কল্পতরু* (১৮৭৪); ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসের নাম *কঙ্কাবতী* (১২৯৯), *ফোকলা দিগম্বর* (১৯০১), *মুক্তামালা* (১৯০১)।

নাটক : জীবনের দ্বন্দ্ব

বাঙলাদেশের চিরকালের নাটক 'যাত্রা'। নাটক বলতে আজ যা বোঝায়, তা আধুনিক কালের সৃষ্টি। যাত্রার সাথে নাটকের পার্থক্য অনেক। যাত্রা পুরোনো কালের, নাটক নতুন কালের। বাঙলা নাটকের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এক বিদেশিকে। সে-বিদেশির দেশ রাশিয়া; নাম তাঁর গেরাসিম লেবেদেফ [১৭৪৯–১৮১৮]। নাটক আর জ্ঞানপাগল এ-লোকটি কলকাতা আসেন আঠারোশতকের শেষদিকে। তিনিই কলকাতায়

সবার আগে মঞ্চস্থ করেন নাটক। তিনি "ডিসগাইস" নামে একটি প্রহসনের অনুবাদ মঞ্চস্থ করেন ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁকে অনুসরণ করে এরপর এ-দেশে গ'ড়ে ওঠে মঞ্চ, এবং লিখিত ও অভিনীত হ'তে থাকে নাটক।

কিন্তু প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটক লিখিত হ'তে লেগেছিলো আরো অর্ধেক শতাব্দীরও বেশি সময়। ১৮৫২ সাল বাঙলা নাটকের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা। এ-বছরে লেখা হয় প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটক। লেখা হয় কমেডি বা মিলনমধুর নাটক, লেখা হয় ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক। বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটকটির নাম *ভদ্রার্জুন* (১৮৫২), লিখেছিলেন তারাচরণ শিকদার। এটি একটি কমেডি। এ-নাটক প্রকাশের কিছুদিন পরে, এ-বছরই, প্রকাশিত হয় প্রথম ট্র্যাজেডি *কীর্তিবিলাস* (১৮৫২)। লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। ভদ্রার্জুন নাটকের কাহিনী নেয়া হয়েছিল মহাভারত থেকে। মহাভারতের গল্পে আছে অর্জুন কৃষ্ণের বোন সুভদ্রাকে হরণ করে। সে-হরণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এটি। *কীর্তিবিলাস*-এর কাহিনী বেশ জটিল। পাঁচটি অঙ্কে নাট্যকার এক বেদনাঘন কাহিনী পরিবেশন করেছেন। ফরাশি ভাষায় একটি নাটক আছে, নাম তার *ফায়েড্রা*। এর কাহিনীর সাথে মিল আছে *কীর্তিবিলাস* নাটকের। এ-সময়ের আরেকজন নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ [১৮১৭–১৮৮৪]। তিনি ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপিয়রের কয়েকটি নাটকের কাহিনী অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় লিখেছিলেন নাটক। তিনি *মার্চেন্ট অফ ভেনিস*-এর কাহিনী নিয়ে লেখেন *ভানুমতী-চিত্তবিলাসনাটক* (১৮৫৩), *রোমিও-জুলিয়েট*-এর গল্প নিয়ে লেখেন *চারুমুখচিত্তহরা* (১৮৬৪) নাটক। তাঁর আরো দুটি নাটক *কৌরব বিয়োগ* (১৮৫৮), *রজতগিরিনন্দিনী* (১৮৭৪)।

এ-সময় নাটক লিখে খুব নাম করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২–১৮৮৬]। রামনারায়ণ বিদেশি সাহিত্যের সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। চিন্তাভাবনায় ছিলেন একেবারে দেশি। তিনি লিখেছিলেন অনেকগুলো নাটক, সেগুলোতে নাটুকেপনা আছে ভীষণভাবে। তাই তখনকার লোকেরা রামায়ণকে বলতো 'নাটুকে *রামনারায়ণ*'। তাঁর নাটকগুলো হচ্ছে *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪), *বেনীসংহার* (১৮৫৬), *রত্নাবলী* (১৮৫৮), *অভিজ্ঞানশকুন্তল* (১৮৬০), *মালতীমাধব* (১৮৬৭), *রুক্মিনীহরণ* (১৮৭১), *কংসবধ* (১৮৭৫), *ধর্মবিজয়* (১৮৭৫), *নবনাটক* (১৮৬৬)। তাঁর কয়েকটি প্রহসন হচ্ছে *যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয়সংকট, বুঝলে কিনা*। *কুলীনকুলসর্বস্ব* তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। এ-নাটকটি রচনার এক চমৎকার ইতিহাস আছে। জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কৌলীন্যপ্রথার অপকারিতা দেখিয়ে যিনি সবচেয়ে ভালো নাটক লিখতে পারবেন, তাঁকে তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবেন। কৌলীন্যপ্রথার অপকারিতা দেখিয়ে রামনারায়ণ রচনা করেন *কুলীনকুলসর্বস্ব* এবং পান পুরস্কার। তিনি *নবনাটক* রচনা করেছিলেন বহুবিবাহের দোষ দেখিয়ে। এটিও পেয়েছিলো পুরস্কার। এ-সময়ের আরো কয়েকজন নাট্যকার হচ্ছেন উমেশচন্দ্র মিত্র, নন্দকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ। উমেশ মিত্র বিধবাবিবাহের পক্ষে লেখেন *বিধবাবিবাহনাটক* (১৮৫৬), তাঁর অন্য নাটক হলো *সীতার বনবাস নাটক* (১২৭২)। নন্দকুমারের নাটকের নাম *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* (১৮৫৫)। কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন সেকালের এক বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র তিরিশ বছর [১৮৪০–১৮৭০]। তিনি রচনা করেছিলেন *সাবিত্রী-সত্যবান* (১৮৫৮), *মালতীমাধব*

(১৮৫৯)। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মারা যান কালীপ্রসন্ন; আর বাঙলা সাহিত্য হারায় এক অসাধারণ প্রতিভাকে।

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আসেন বাঙলা নাটকের অমর পুরুষ মধুসূদন দত্ত। যেমন কবিতার ক্ষেত্রে তিনি এসেছিলেন সকলকে চমকিত ক'রে এবং রাশিরাশি সোনার ফসল ফলিয়ে গিয়েছিলেন, নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি আসেন তেমনি ক'রে। আসেন আর নাটকের সোনার ফসল ফলান। মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন নাটক হাতে ক'রেই। মধুসূদন অনেক কিছু করেছেন তীব্র ঝোঁকের বশে, অনেকটা বাজি ধ'রে। তাঁর ছিলো অসামান্য প্রতিভা, তাই তিনি হঠাৎ ক'রে দিগ্বিজয় করতে পেরেছেন। অন্যরা যা পারেন না অনেকদিন সাধনা ক'রে, মধুসূদন তা করেন কলম হাতে নিয়েই। মধুসূদনের সময় নাটক লেখা হতো অনেক, এবং ভীষণ উৎসবের সাথে সেগুলো হতো অভিনীত। কিন্তু ও-সকল নাটককে তিনি মেনে নিতে পারেন নি নাটক ব'লে।

তাঁর চোখের সামনে ছিলো গ্রিক ও ইংরেজি মহৎ নাট্যসৃষ্টিগুলো। তিনি তখনকার বাঙলা নাটকের দীনতায় দুঃখ বোধ করতেন। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাআড়ম্বরে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী*। মধুসূদন দেখেন সে-নাট্যাভিনয়। ওই নাটক দেখে অনেকটা উপহাস করেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করেন অল্পকালের মধ্যে তিনি লিখে দেবেন সত্যিকার নাটক। লিখেও ফেলেন একটি নাটক, নাম তার *শর্মিষ্ঠা*। এটি বের হয় ১৮৫৯ অব্দে। এটি বাঙলা ভাষায় সত্যিকারের প্রথম আধুনিক নাটক। কাহিনীবিন্যাস, অঙ্ক ও দৃশ্যসজ্জা, ভাষা, নাটকীয়তা, সব মিলে এটি বাঙলা ভাষার প্রথম খাঁটি নাটক। মধুসূদন *শর্মিষ্ঠা* নাটকের শুরুতে সেকালের নাটকের গ্রাম্যতায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

বাঙলা নাটককে কুনাটকের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন মধুসূদন; তবে বাঙলার মঞ্চ আজো কুনাটকেরই দখলে।

মধুসূদন *শর্মিষ্ঠা* নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে। মহাভারতে যযাতি ও শর্মিষ্ঠার কাহিনী রয়েছে। মধুসূদন সে-পুরানো গল্পকে নতুন কালের মতো ক'রে পরিবেশন করেন। নাটকটি মিলনমধুর। এরপরে মধুসূদন লেখেন দুটি প্রহসন : *একেই কি বলে সভ্যতা?*, ও *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*। প্রথম প্রহসনটিতে মধুসূদন বিদ্রূপের আঘাত করেন সেকালের বিপথগামী তরুণদের এবং দ্বিতীয়টিতে আঘাত করেন ভীমরতিগ্রস্ত বুড়োদের। তখন বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ছিলো মোটা রসিকতা। প্রহসন দুটিতে মধুসূদন রসিকতাকে করে তোলেন আধুনিক রুচিসম্মত।

১৮৬০-এ বেরোয় মধুসূদনের দ্বিতীয়, অভিনব, নাটক *পদ্মাবতী*। তিনি *শর্মিষ্ঠা* নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে, *পদ্মাবতীর* কাহিনী নেন গ্রিক উপকথা থেকে। গ্রিক উপকথায় 'প্যারিসের বিচার' নামে একটি গল্প আছে। গল্পটি চমৎকার। দেবী ডিসকর্ডিয়া তৈরি করে একটি সোনার আপেল। তার উদ্দেশ্য ভালো ছিলো না, সে চেয়েছিলো জুনো, প্যালাস এবং ভেনাস নামক তিন দেবীর মধ্যে বিরোধ বাধাতে। সে ওই আপেলটির গায়ে 'যে দেবী সবচেয়ে রূপসী সে পাবে এ-আপেল' কথাটি লিখে আপেলটি ফেলে দেয় জুনো, প্যালাস এবং ভেনাসের সামনে। তিনজনই নিজেকে রূপসী ভাবে এবং

কামনা করে আপেলটি। তাই তারা বিচারক মানে রাজপুত্র প্যারিসকে। তারা বলে, আপনি যাকে সবচেয়ে রূপসী বিবেচনা করেন, তাকে দিন এ-আপেলটি। প্যারিসকে একেক দেবী একেক লোভ দেখায়। প্যারিস ভেনাসকে দেয় আপেলটি। এ-নিয়ে পরে প্যারিস জড়িয়ে পড়েছিলো মহাসংকটে, সে-সংকটের কাহিনী আছে হোমারের *ইলিয়াড* কাব্যে। মধুসূদন এ-গ্রিক গল্পকে ভারতীয় রূপ দিয়ে লেখেন "পদ্মাবতী"।

তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক *কৃষ্ণকুমারীনাটক*। এটি তিনি লিখেছিলেন ১৮৬০-এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে, আর এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ অব্দে। এটি এক মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি। উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর জীবনের করুণ পরিণতি এর বিষয়। মধুসূদন এ-নাটকের কাহিনীর বীজ পেয়েছিলেন টডের লেখা *রাজস্থানের কাহিনী* গ্রন্থে। মধুসূদন এ-নাটকে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আদর্শ পুরোপুরি কাজে লাগান। এর কাহিনী এমন : উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারী অপরূপ রূপসী। তার পিতা ভীমসিংহ। রাজ্য হিশেবে উদয়পুর দুর্বল। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। অন্যদিকে মরুদেশের রাজা মানসিংহও দেয় কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ের প্রস্তাব। তারা দুজনই উপযুক্ত। ভীমসিংহ জয়সিংহের সাথে বিয়ে দিতে চায় কৃষ্ণাকে। কিন্তু কৃষ্ণা অনুরাগী মানসিংহের। রাজা পড়ে বিপদে; সে কাকে দান করবে কন্যা? একজনকে দিলে আরেকজন আক্রমণ করবে রাজ্য। চারদিক থেকে আক্রান্ত হয় ভীমসিংহের দুর্বল রাজ্য উদয়পুর। রাজ্যরক্ষার এক ভয়াবহ প্রস্তাব রাজাকে দেয় মন্ত্রী। তা হচ্ছে যদি কৃষ্ণাকে হত্যা করা হয় তবে আর কোনো বিপদ থাকবে না। রাজা তাতে রাজি হয়। সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের ওপর ভার পড়ে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার। বলেন্দ্র হত্যা করতে গিয়ে নিজের আবেগে ব্যর্থ হয়; কিন্তু কৃষ্ণা নিজে বুকে তরবারি বিদ্ধ ক'রে আত্মহত্যা করে। এ-কাহিনীকে এক বেদনাকরুণ রূপ দিয়েছেন মধুসূদন তাঁর নাটকে। কাহিনী যতোই এগিয়ে যায়, আমরা ততই এগিয়ে যাই বিষাদময় পরিণতির দিকে। নিজের ভাগ্যের জন্যে বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলো না কৃষ্ণা। মধুসূদন তাকে এঁকেছেন সহজ সরল আকর্ষণীয় ক'রে। তার মতো নিষ্পাপ মেয়ে যে এরকম পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াবে, তা নিয়তি ছাড়া আর কে বলতে পারে! তবে আমরা আর নিয়তিতে বিশ্বাস করি না। মধুসূদন এরপরে লিখেছিলেন আরেকটি নাটক; নাম *মায়াকানন* (১৮৭৪)। এটি বের হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

মধুসূদনের সাথেসাথে একজন দুঃসাহসী প্রতিভাবান নাট্যকার আসেন বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে। তিনি দীনবন্ধু মিত্র [১৮৩০-১৮৭৩]। তিনি অল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু লিখেছিলেন অনেকগুলো নাটক। তাঁর প্রথম নাটকটি আলোড়ন জাগায় দারুণভাবে। দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। তাঁর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র। দীনবন্ধু ডাকবিভাগে চাকুরি করতেন। কিন্তু সরকারি চাকুরি তাঁকে ভীত করতে পারে নি। তাঁর প্রথম নাটকের নাম *নীলদর্পণনাটক*। নাটকটি বেরোয় ১৮৬০-এ। প্রকাশের সাথে সাথে এটি সাহিত্য এবং সমাজে জাগায় আলোড়ন। এটি এক বিপ্লবী রচনা। তখন বাঙলার গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠেছিলো। নীলকরদের অত্যাচার তিনি তুলে ধরেন এ-নাটকে। নাটকটি প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। তখন নাটকে নাট্যকারের নাম ছিলো না, তিনি গোপন করেন নিজের নাম। এ-নাটকে তিনি নীলকরদের অত্যাচারে একটি পরিবারের ধ্বংসের কাহিনী বলেন। সে-পরিবারটি নবীনমাধবদের। দীনবন্ধু তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নাটকে। নাটক

হিশেবে এটি অসাধারণ হয়তো নয়, কিন্তু সামাজিক কারণে এটিকে অসাধারণ বলতে হয়। এ-নাটকে মৃত্যু ও বিলাপের বাড়াবাড়ি আছে, নাট্যগুণও সব অঙ্কে রক্ষা পায় নি। তবু নাটকটি একটি মহৎ সৃষ্টি। এটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন পাদ্রি লং এবং মধুসূদন। দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটক *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬), *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *লীলাবতী* (১৮৬৭), *জামাই বারিক* (১৮৭২), *কমলে-কামিনী* (১৮৭৩)। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য *সধবার একাদশী*। এ-নাটকে নিমচাঁদ নামক এক শিক্ষিত অথচ পতিত তরুণের বেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে। নিমচাঁদের মেজাজ দেখে অনেকে মনে করেন এ-নাটকে তিনি নিমচাঁদের ছদ্মবেশে মধুসূদনের কথা বলেছেন।

দীনবন্ধুর পরে আসেন মনোমোহন বসু [১৮৩১–১৯১২]। তিনি লেখেন *রামের অধিবাস* ও *বনবাস* (১৮৬৭), *প্রণয় পরীক্ষা* (১৮৬৯), *সতী* (১৮৭৩), *হরিশচন্দ্র* (১৮৭৫), ইত্যাদি নাটক। এ-সময়ে আসেন আরো অনেক নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন লেখেন *বসন্তকুমারী* (১৮৭৩), *জমিদার দর্পণ* (১৮৭৩); মণিমোহন সরকার লেখেন *মহাশ্বেতা* (১২৬৬); হরিশচন্দ্র মিত্র লেখেন *ম্যাও ধরবে কে?* (১৮৬২)।

উনিশশতকের শেষাংশে মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন অনেক নাট্যকার। তাঁরা সবাই নাটককে এগিয়ে দিয়েছেন। সকলের কথা বলবো না, শুধু উল্লেখ করবো কয়েকজন প্রধান নাট্যকারকে। তাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯–১৯২৫], গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪–১৯১২], অমৃতলাল বসু [১৮৫৩–১৯২৯], দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩–১৯১৩], ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৪–১৯২৭]।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নানা গুণে গুণী; তীব্র দেশপ্রেমিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অনেক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গান গাইতেন, নাটক লিখতেন, দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন, বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ সাধন করতে চাইতেন। তিনি রচনা করেছিলেন অনেকগুলো নাটক ও প্রহসন। তাঁর রচনা ছিলো মঞ্চসফল। তিনি প্রথমে রচনা করেন একটি প্রহসন, নাম *কিঞ্চিৎ জলযোগ* (১৮৭২)। এটিতে তিনি বিদ্রূপ করেন নব্যব্রাহ্মদের অর্থাৎ তাদের, যারা ছিলো কেশবচন্দ্র সেনের অনুসারী। তাঁর আরেকটি প্রহসন হলো *অলীক বাবু* (১৮৭৭)। এটির নায়ক বাবু অলীকপ্রকাশ মিথ্যে কথাকে শিল্পকলায় পরিণত করেছিলো। বেশ মজার বই এটি। তাঁর কয়েকটি নাটক হচ্ছে *পুরুবিক্রম* (১৮৭৪), *সরোজিনী* (১৮৭৫), *অশ্রুমতি* (১৮৭৯), *স্বপ্নময়ী* (১৮৮২)। এছাড়া তিনি অনুবাদ করেছিলেন অনেকগুলো নাটক; ইংরেজি থেকে, ফরাশি থেকে, সংস্কৃত থেকে। ইংরেজি ও ফরাশি থেকে তিনি অনুবাদ করেন *রজতগিরি* (১৩১০), *হঠাৎ নবাব* (১৮৮৪), *দায়ে পড়ে দারগ্রহ* (১৩০৯)। সংস্কৃত থেকে তিনি অনুবাদ করেছিলেন অনেক নাটক। তাঁর কয়েকটি হচ্ছে *অভিজ্ঞানশকুন্তল, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক*।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন নট ও নাট্যকার। তিনি লিখেছিলেন পঁচাত্তরটি নাটক; বাঙলাদেশে এতো নাটক আর কোনো নাট্যকার লেখেন নি। তাঁর নাটক শিল্পমূল্যে খুব উচ্চ নয়, তাঁর অধিকাংশ নাটকই মধুসূদনের ভাষায় 'কুনাট্য', তবে দর্শকেরা মজেছিলো এগুলোতে। তাঁর কয়েকটি নাটক *আনন্দ রহো* (১২৮৮), *চৈতন্যলীলা, প্রফুল্ল* (১৮৯১), *হারানিধি* (১৮৯০), *জনা* (১৮৯৩)। তিনি শেক্সপিয়রের *ম্যাকবেথ* অনুবাদ করেছিলেন। তিনি দেশপ্রেমমূলক নাটক লিখেছিলেন *সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজি*। অমৃতলাল বসুও ছিলেন

অভিনেতা ও নাট্যকার। তিনি অনেকগুলো প্রহসন রচনা করেছেন। তাঁর নাটক ও প্রহসন হচ্ছে *হীরকচূর্ণ* (১৮৭৫), *তরুবালা* (১২৯৭), *চোরের উপর বাটপারি* (১২৮৩), *ডিসমিস, তাজ্জব ব্যাপার*। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন নাটক ও প্রহসন। তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন। তাঁর নাটক ও প্রহসন হলো *কল্কি অবতার* (১৮৯৫), *বিরহ* (১৮৯৭), *তারাবাই* (১৯০৩), *প্রতাপসিংহ* (১৯০৫), *দুর্গাদাস* (১৯০৬), *নূরজাহান* (১৯০৮), *মেবার পতন* (১৯০৮), *শাজাহান* (১৯০৯), *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১)। তাঁর নাটকে রয়েছে অনেক স্মরণীয় সংলাপ, যেগুলো একসময় মুখেমুখে ফিরতো। *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকে আছে 'কি বিচিত্র এই দেশ।' ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন চল্লিশটির মতো নাটক। তাঁর দুটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক *প্রতাপ-আদিত্য* (১৯০৩), ও *আলমগীর* (১৯২১)। তিনি বিশেষ জনপ্রিয় *আলিবাবা* (১৮৯৭) নাটকের জন্যে। উনিশ ও বিশশতকে বাঙলা ভাষায় অসংখ্য 'নাটক' লেখা হয়েছে, তার মধ্য থেকে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলো বাদ দিলে যা থাকে, তার শিল্পমূল্য খুবই কম।

রবীন্দ্রনাথ : প্রতিদিনের সূর্য

আকাশে সূর্য ওঠে প্রতিদিন, আমরা সূর্যের স্নেহ পাই সারাক্ষণ। সূর্য ছাড়া আমাদের চলে না। তেমনি আমাদের আছেন একজন, যিনি আমাদের প্রতিদিনের সূর্য। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১–১৯৪১]। তিনি আমাদের জীবনে সারাক্ষণ আলো দিচ্ছেন। তিনি বাঙলা ভাষার সবার বড়ো কবি, তাই নয় শুধু, তিনি আমাদের সব। তিনি কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, নাটক রচনা করেছেন, গান লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি কী লেখেন নি? তিনি একাই বাঙলা সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন কয়েকশো বছর। আজ যে বাঙলা সাহিত্য বেশ ধনী, তার বড়ো কারণ তিনি। তাই রবীন্দ্রনাথের কথা সহজে অল্প কথায় বলা খুব কঠিন। তাঁর কথা ভালোভাবে লিখতে হ'লে বিরাট বিরাট বই লিখতে হয়। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ১৮৬১ অব্দের মে মাসের সাত তারিখে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। বঙ্গাব্দ অনুসারে দিনটি ছিলো পঁচিশে বৈশাখ। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মায়ের নাম সারদা দেবী। তিনি লোকান্তরিত হন ১৯৪১ অব্দের আগস্ট মাসের সাত তারিখে। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২-এ শ্রাবণ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের বাড়ির সবাই ছিলেন সাহিত্যে উৎসাহী। তাঁর পিতা ছিলেন লেখক, বড়ো ভাইয়েরা ছিলেন লেখক, বড়ো বোন ছিলেন লেখিকা। তিনিও তাঁদের দেখাদেখি লেখা শুরু করেছিলেন শিশুবয়সে। তিনি ভালোবাসতেন কবিতা পড়তে, ভালোবাসতেন গাছপালার সৌন্দর্য দেখতে। গাছপালা অর্থাৎ প্রকৃতিই ছিল তাঁর বড়ো শিক্ষক। স্কুল তাঁর ভালো লাগতো না। স্কুলের দেয়ালগুলো মনে হতো পাহারাওলাদের মতো কঠোর। তাঁর জীবনকাহিনী তোমরা তাঁর নিজের লেখা দুটি বই থেকে জেনে নিতে পারো। সে-বই দুটি হচ্ছে *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা*। এ-বই দু'টিতে তিনি নিজের কথা

বলেছেন মধুর ক'রে; তবে তাঁর আরো অনেক কথা ছিলো বলার, কিন্তু বলেন নি। তাঁর গোপন কথা তিনি গোপন ক'রে গেছেন, কেননা আমাদের সমাজ হচ্ছে গোপনীয়তার সমাজ। সব সত্য এখানে প্রকাশ করা যায় না।

তাঁর যে-কবিতাটি সবার আগে নিজের নামে বেরিয়েছিলো, সেটির নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। এর আগে তাঁর নিজের নামে কোনো লেখা বের হয় নি। তাঁর যে-বইটি সবার আগে ছাপা হয়, সেটির নাম *কবিকাহিনী*। বইটি বেরিয়েছিলো ১৮৭৮ অব্দে। তবে এটি তাঁর লেখা প্রথম বই নয়। এ-বই বের হবার দু-বছর আগে তিনি লিখেছিলেন *বনফুল* নামে একটি কবিতার বই। *বনফুল* রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম বই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অনেক অনেক বই, সব বইয়ের নাম আমিও জানি না। তিনি লিখেছিলেন সব রকমের লেখা : কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ, নাটক, কাব্যনাটক, ভ্রমণকাহিনী, পাঠ্যবই, সমালোচনা, ব্যঙ্গরচনা, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি সবকিছু লিখেছেন তিনি। সবদিকেই তাঁর সার্থকতা সকলের চেয়ে বেশি। তাঁর প্রতিভা আমাদের বিস্ময়। তিনি পৃথিবীর এক প্রধান রোম্যান্টিক কবি। তিনিই সবার আগে এশীয়দের মধ্যে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। ১৯১৩ অব্দে। নোবেল পুরস্কার তাঁর মতো প্রতিভার জন্যে বড়ো কিছু নয়; তবে এটি পাওয়া বেশ ভালো হয়েছে তাঁর ও বাঙলা সাহিত্যের জন্যে। নইলে হয়তো বাঙালি বুঝতে পারতো না তিনি কতো বড়ো কবি!

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছুই জানো। যা জানো না, তা হয়তো জেনে ফেলবে আগামীকাল। তাই আমি তাঁর সম্বন্ধে—বলা যায়—কিছুই বলবো না। ইচ্ছে করলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে যে-কোনো পাঠাগারে গিয়ে। তোমরা পড়তে পারো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা তাঁর বিশাল জীবনীবই। বইটি চার খণ্ডে। বইটির নাম *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*। বইটিকে সংক্ষেপে বলা হয় *রবীন্দ্রজীবনী*। এটি বিরাট বই, দেখলেই যদি ভয় লাগে, তবে পড়তে পারো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েরই লেখা আরেকটি বই, নাম *রবীন্দ্রজীবনকথা*। বেশি মোটা নয় বইটি, বেশ সরলভাবে লেখা। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখা অধিকাংশ বইয়ের নাম জানিয়ে দিচ্ছি।

কবিতা

কবিকাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), ছবি ও গান (১৮৮৪), শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), সোনার তরী (১৮৯৪), নদী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), কথা (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), শিশু (১৯০৯), গীতাঞ্জলি (১৯১০), স্মরণ (১৯১৪), বলাকা (১৯১৬), পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), লেখন (১৯২৭), মহুয়া (১৯২৯), বনবাণী (১৯৩১), পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী (১৯৩৯), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), ছড়া (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১), স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৫), বৈকালী (১৯৫১), চিত্রবিচিত্র (১৯৫৪)।

কাব্যনাট্য গীতিনাট্য ও নাটক প্রহসন

বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮৮), রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), নলিনী (১৮৮৪), গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), মালিনী (১৯১২), বিদায় অভিশাপ (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), ঋণশোধ (১৯২২), বসন্ত (১৯২৩), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), চিরকুমার সভা (১৯২৬), শোধবোধ (১৯২৬), নটীর পূজা (১৯২৬), রক্তকরবী (১৯২৬), ঋতুরঙ্গ (১৯২৭), শেষরক্ষা (১৯২৮), পরিত্রাণ (১৯২৯), তপতী (১৯২৯), নবীন (১৯৩১), কালের যাত্রা (১৯৩২), চণ্ডালিকা (১৯৩৩), তাসের দেশ (১৯৩৩), বাঁশরী (১৯৩৩), শ্রাবণগাথা (১৯৩৪), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯)।

উপন্যাস

করুণা (অসমাপ্ত, ১৮৭৭), বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৪), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯৩৪)।

গল্প

ছোটগল্প (১৮৯৪), বিচিত্র গল্প (১৮৯৪), কথা চতুষ্টয় (১৮৯৪), গল্পদশক (১৮৯৫), কর্মফল (১৯০৩), গল্প চারিটি (১৯১২), গল্পসপ্তক (১৯১৬), পয়লা নম্বর (১৯২০), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪০) গল্পসল্প (১৯৪১)।

ভ্রমণকাহিনী

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি [প্রথম খণ্ড ১৮৯১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৩], জাপান যাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯০৮), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), জাপানে পারস্যে (১৯৩৬), পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)।

ভাষা ও সাহিত্যসমালোচনা

সমালোচনা (১৮৮৮), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), লোকসাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), ছন্দ (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)।

গান

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৯৩), বাউল (১৯০৫), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪), শাপমোচন (১৯৩১), বৈকালী (১৯৫১), প্রবাহিণী (১৯৫২)।

প্রবন্ধ : নানা রকমের

বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), রামমোহন রায় (১৮৮৫), আলোচনা (১৮৮৫), মন্ত্রী অভিষেক (১৮৯০), পঞ্চভূত (১৮৯৭), উপনিষদ ব্রহ্ম (১৯০১), আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), চারিত্রপূজা (১৯০৭), রাজাপ্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), সমাজ

(১৯০৮), ধর্ম (১৯০৮), শান্তিনিকেতন (১-৮ অংশ, ১৯০৯), বিদ্যাসাগরচরিত (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (৯-১১ অংশ, ১৯১০), শান্তিনিকেতন (১২-১৩ অংশ, ১৯১১), শান্তিনিকেতন (১৪ অংশ, ১৯১৫), শান্তিনিকেতন (১৫-১৭ অংশ, ১৯১৬), সঞ্চয় (১৯১৬), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৯৩৩), শান্তিনিকেতন (প্রথম খণ্ড ১৯৩৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৫), প্রাক্তনী (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১), আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৯৪১), স্মৃতি (১৯৪১), আত্মপরিচয় (১৯৪৩), মহাত্মা গান্ধী (১৯৪৮), বিশ্বভারতী (১৯৫১), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯৫১), সমবায়নীতি (১৯৫৪), ইতিহাস (১৯৫৫), বুদ্ধদেব (কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা এতে আছে, ১৯৫৬), খৃষ্ট (১৯৫৯)।

নিজের জীবনকথা

জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র (১৮৮৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), সুর ও সংগতি (১৯৩৫), চিঠিপত্র ১ (১৯৪২), চিঠিপত্র ২ (১৯৪২), চিঠিপত্র ৩ (১৯৪২), চিঠিপত্র ৪ (১৯৪৩), চিঠিপত্র ৫ (১৯৪৫), চিঠিপত্র ৬ (১৯৫৭), চিঠিপত্র ৭ (১৯৬০), ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০)।

বিবিধ রচনা

মহাত্মাজি এ্যান্ড দি ডিপ্রেসড হিউম্যানেটি (১৯৩২), লিপিকা (১৯২২), চিত্রলিপি (প্রথমটি, ১৯৪০), চিত্রলিপি (দ্বিতীয়টি, ১৯৫১)।

এছাড়াও তাঁর আরো কিছু রচনা রয়েছে। যদি তাঁর সব বইয়ের নাম জানতে ইচ্ছে হয়, তবে পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করেছেন, সেটি দেখে নিও। ওপরে প্রতিটি বইয়ের নামের পাশের বন্ধনীর ভেতরে যে-অব্দগুলো দেয়া হয়েছে, তা বইগুলোর প্রথম প্রকাশের অব্দ, লেখার নয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সংকলনগুলোর কথা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অনেক বই, কারো পক্ষে সবগুলো বইয়ের নাম মনে রাখা মুশকিল। এতো রকমের বই আর এতো রকমের নাম দেখে মাথা বিকল হয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের বইগুলো দিয়েই গ'ড়ে তোলা যায় একটি বড়ো পাঠাগার। তিনি অজস্র বই লিখেছেন। হয়েছে তাঁর লেখার অজস্র সংকলন। সংকলনগুলোতে বিভিন্ন বই থেকে একই রকমের লেখা বাছাই ক'রে ছাপা হয়েছে। এর ফলে তাঁর বইগুলোর ভেতর থেকে জন্মেছে আরো অনেক বই। রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রথম সংকলন বের হয়েছিলো অনেক আগে, তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেটা ১৮৯৬। এ-সংকলনে ছাপা হয়েছিলো তাঁর বিভিন্ন বইয়ের অনেকগুলো কবিতা। এটির নাম ছিলো *কাব্যগ্রন্থাবলী*। এরপরে হ'তে থাকে তাঁর লেখার অনেক অনেক সংকলন। সে-সব সংকলনের মধ্যে যেগুলো খুব বিখ্যাত, তাদের কিছু নামের কথা বলছি, কিছু পরিচয়ও দিচ্ছি।

[১] ***কাব্যগ্রন্থাবলী*** (১৮৯৬)। এটি তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ। এর মধ্যে তাঁর বিভিন্ন কাব্যের অনেক কবিতা মুদ্রিত হয়।

[২] ***গল্পগুচ্ছ*** । এর প্রথম খণ্ডটি বেরিয়েছিলো ১৯০০ অব্দে। *গল্পগুচ্ছ* আজকাল সকলের প্রিয় ও পরিচিত বই। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বইগুলোর নাম আমরা অনেকেই করতে

পারবো না। কেননা আজ সে-সব বই বিশেষ প্রচলিত নয়। আজকাল সবাই জানে যে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বইয়ের নাম *গল্পগুচ্ছ*। আসলে এটি হলো তাঁর গল্পগুলোর সংকলন বই। এর প্রথম খণ্ডটি বের হয় ১৯০০ অব্দে। ১৯০৮–১৯০৯ অব্দে তিনি তখন পর্যন্ত যতো গল্প লিখেছিলেন, সেগুলো *গল্পগুচ্ছ* নামে পাঁচ ভাগে বের হয়। প্রকাশ করেছিলো ইনডিয়ান প্রেস। ১৯২৬ অব্দে বিশ্বভারতী বের করে তিন খণ্ডে তাঁর সবগুলো গল্প; তখনো এর নাম থাকে *গল্পগুচ্ছ*। আজ এ বইটিই নানারূপে বাজারে, লাইব্রেরীতে আছে।

[৩] *কাব্যগ্রন্থ* (১ থেকে ৯ ভাগ)। এটি কবির দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ। বের হয়েছিলো ১৯০৩–১৯০৪ অব্দে। এ-সংকলনে তাঁর কবিতাগুলোকে সাজানো হয়েছিলো কবিতার বিষয় হিশেবে। প্রতিটি বিভাগের এক একটি নাম ছিলো। যেমন, যাত্রা, হৃদয় অরণ্য, বিশ্ব, সোনার তরী ইত্যাদি।

[৪] *রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী* । এটি বের হয় ১৯০৪ অব্দে। এটিতে স্থান পায় তাঁর অনেকগুলো নাটক, উপন্যাস ও গল্প।

[৫] *চয়নিকা* (১৯০৯)। রবীন্দ্রনাথের ভালো ভালো অনেকগুলো কবিতা এ-বইতে সংকলিত হয়েছিলো। এ-জাতীয় কবিতা সংকলনের যে-বইটি আমরা আজ ব্যবহার করি, সেটি "সঞ্চয়িতা"। এ-বইটি আজকাল আর দেখা যায় না।

[৬] *গীতবিতান* । এটি রবীন্দ্রনাথের গানের সংগ্রহ। আজকাল ঘরেঘরে এটি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের আরো কয়েকটি সংকলন হয়েছিলো, কিন্তু এটি সবার সেরা। এটি প্রথম বের হয় ১৯৩১-এ।

[৭] *সঞ্চয়িতা* (১৯৩১)। রবীন্দ্রনাথের সব কাব্য থেকে কবিতা নিয়ে তৈরি হয়েছে এ-বইটি। এটি আজ আমাদের সকল সময়ের সাথী। বাঙলাদেশে কবিতা পড়ে এমন কে আছে যে এটি দেখে নি! এ-বইয়ের কবিতাগুলো চয়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।

[৮] *রবীন্দ্ররচনাবলী* । এ-রচনাবলীতে সংগ্রহ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সব বই। এর প্রথম খণ্ড বের হয়েছিলো ১৯৩৯ অব্দে। তারপর প্রতি বছর বের হ'তে থাকে রবীন্দ্ররচনাবলীর একেকটি খণ্ড। প্রতিটি খণ্ডে থাকে তাঁর কয়েকটি কবিতা গল্প প্রবন্ধের বই, থাকে উপন্যাস। আজ পর্যন্ত আটাশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা

রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রোপচারের ফলে মারা যান। অস্ত্রোপচার না হ'লে আরো কিছুদিন বাঁচতেন। অস্ত্রোপচারের কিছু আগে ১৯৪১-এর জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সকাল সাড়ে নটায় লেখেন তিনি তাঁর শেষ কবিতা। কবিতাটির অংশ :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
　　বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
　　তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। তবে মৃত্যুর আগে ট'লে গিয়েছিলো কি তাঁর বিশ্বাস? বিশ্বাস রাখা খুবই কঠিন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও।

বিশশতকের আলো : আধুনিকতা

আমরা বিশশতকের অধিবাসী। আর একটি দশক কেটে গেলে আমরা পৌঁছোবো একুশশতকে। বাঙলা সাহিত্যের শুরু হয়েছিলো আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি আগে। শুরুর দিকে ছিলেন কাহ্নপাদ-লুইপাদেরা; আমরা আছি এ-প্রান্তে। তবে শেষ প্রান্তে নয়। আরো অনেক শতক টিকে থাকবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য। রূপ নেবে নতুন নতুন, হয়তো এমন রূপ নেবে, এমন হবে তার শোভা, যা আজ ভাবতেও পারছি না। গত এক হাজার বছরেও নিয়েছে নতুন নতুন রূপ। ছড়িয়েছে অভাবিত শোভা আর সৌন্দর্য। এক হাজার বছরের দীর্ঘ যাত্রায় কতো রকমের পথ তৈরি করেছে, বাঁক নিয়েছে নানা ধরনের। উনিশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে উঠেছিলো একধরনের আধুনিক। উনিশশতকি আধুনিক। বিশশতকে বাঙলা সাহিত্য হয়ে ওঠে নতুন ধরনের আলোতে উজ্জ্বল। হয়ে ওঠে বিশশতকি আধুনিক। আধুনিকতা বলতে এখন আমরা বিশশতকের আধুনিকতাকেই বুঝে থাকি। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক সব এলাকায়ই বিশশতকে দেখা দেয় নতুন চেতনা, নতুন সৌন্দর্য। বিশশতকের বাঙলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছুরিত হয় দুরূহ জটিল অভিনব আলো।

প্রতিটি শতক বা শতাব্দীর থাকে নিজস্ব চেতনা। উনিশশতকের নিজস্ব ভালো লাগা মন্দ লাগা ছিলো, নিজস্ব আবেগঅনুভূতি, স্বপ্ন, চেতনা ছিলো। তার প্রকাশ ঘটেছে ওই শতকের সাহিত্যে। একটি শতক কেটে গিয়ে যখন আসে আরেকটি শতক, তখন নববর্ষের মতো রাতারাতি নতুন চেতনার উন্মেষ-বিকাশ ঘটে না। নতুন শতকের এক বা দু-দশক ধ'রে জীবনে ও সাহিত্যে রাজত্ব করতে থাকে পুরোনো শতকেরই চেতনা। তারপর এক সময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে। হয়তোবা দেশে বা বিশ্বে ঘটে কোনো বড়ো ঘটনা, যা প্রবলভাবে আলোড়িত করে জীবনকে। তখন সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন চেতনা অভিনব রূপ ধ'রে দেখা দেয়। ইউরোপে উনিশশতকের শেষ দিকেই উনিশশতকি চেতনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের দেশ প্রথাগত; পুরোনোকে আঁকড়ে থাকতেই আমরা ভালোবাসি। নতুনকে আমরা খুব ভয় করি। তাই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে সময় লাগে। এ-কারণেই বিশশতক আসার পরও দু-দশক ধ'রে বাঙলা সাহিত্যে উনিশশতকের চেতনাই প্রকাশ পেতে থাকে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তখন লিখে চলছিলেন তাঁর অসামান্য কবিতাগুলো। তখনো ওই কবিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সময় আসে নি।

বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে, ১৯১৪–১৯১৮তে, ঘটে মানুষের ইতিহাসের প্রথম সবচেয়ে বড়ো সংকট। ওই সংকটের নাম প্রথম মহাযুদ্ধ। ওই মহাযুদ্ধে আমাদের দেশ পশ্চিমের মতো জড়িয়ে পড়ে নি; কিন্তু তার উত্তাপ থেকে দূরেও থাকতে পারে নি আমাদের দেশ, জীবন ও সাহিত্য। প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপকে বদলে দেয়। বদল ঘটে ইউরোপীয় চেতনার। অবিশ্বাস, ক্লান্তি, অমানবিকতা, নৈরাশ্য প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে সৃষ্টি করে নতুন সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে; এবং বিকশিত হয় বিশশতকের আধুনিক সাহিত্য। তবে তার জন্যে আমাদের প্রায় আড়াই দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। বলা যায়, বাঙলা সাহিত্যে বিশশতক এসেছিলো বিশশতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি। প্রথমে এসেছিলো কবিতায়, যাকে বলি আধুনিক কবিতা। ওই আধুনিক কবিতাই বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, উজ্জ্বলতম আলোকমালা।

বিশশতকের প্রথম দু-দশকে রবীন্দ্রনাথ লিখে চলছিলেন তাঁর চল্লিশোত্তর বয়সের আশ্চর্য কবিতাবলি। তাঁর কবিতার রোম্যান্টিক বন্যায় তখন প্লাবিত পাঠকের চিত্ত। এ-সময় বের হয় তাঁর *নৈবেদ্য* (১৯০১), *খেয়া* (১৯০৬), *শিশু* (১৯০৯), *গীতাঞ্জলি* (১৯১০), *বলাকা* (১৯১৬)। তখন বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্র-যুগ চলছে। তাঁর কবিতা অসামান্য কিন্তু চেতনায় তা উনিশশতকেরই। জীবনের প্রথমার্ধে যে-সব বোধবিশ্বাসআবেগ অঙ্কুরিত হয়েছিলো তাঁর মনোলোকে, এ-সময়ে তাই পুষ্পিত হয়ে উঠছিলো তাঁর কবিতায়। ওই সব পুষ্পের মূল ছিলো উনিশশতকে। তখন দেখা দিয়েছিলেন একগোত্র তরুণ কবি, যাঁরা ছিলেন পুরোপুরি রবীন্দ্রানুসারী। ওই কবিদের কেউকেউ কিছুকিছু চমৎকার কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাতে বিশশতককে পাওয়া যায় না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৮২–১৯২২]। তিনি প্রচুর লিখেছিলেন, হালকা ছন্দের যাদু সৃষ্টি ক'রে 'ছন্দের যাদুকর' উপাধিও পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতার মূল্য কম। তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি; বাঁচলেও যে খুব বড়ো কবি হয়ে উঠতেন, এমন মনে হয় না। তাঁর কয়েকটি কাব্য *বেণু ও বীণা* (১৯০৬), *হোমশিখা* (১৯০৭), *কুহু ও কেকা* (১৯১২), *অভ্র-আবীর* (১৯১৬)। এ-সময়ে যতীন্দ্রমোহন বাগচী [১৮৭৮–১৯৪৮] লিখেছিলেন গুটিকয় মনোরম কবিতা। 'কাজলা-দিদি' নামের একটি বেদনাকাতর কবিতার জন্যে তিনি প্রিয় হয়ে আছেন। তাঁর কাব্য হচ্ছে *রেখা* (১৯১০), *অপরাজিতা* (১৯১৩), *নাগকেশর* (১৯১৭)। কুমুদরঞ্জন মল্লিক [১৮৮২–১৯৭০] লিখেছিলেন পল্লীপ্রেমের কবিতা। তাঁর কাব্য *উজানী* (১৯১১), *বনতুলসী* (১৯১১), *বনমল্লিকা* (১৯১৮), *রজনীগন্ধা* (১৯২১)। তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাবিত। বুদ্ধদেব বসু তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। তাঁরা কবিতায় এমন কিছু করতে পারেন নি যাকে বলা যায় গুরুত্বপূর্ণ। বিশশতকের চেতনা তাঁদের কবিতায় নেই। এ-কবিরা পুড়েছেন রবীন্দ্রআগুনে।

ওই সময়ে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিলো। বেরিয়ে যে আসতে হবে, তাই মনে পড়ে নি অধিকাংশের। কারোকারো মনে পড়ছিলো; এবং খুঁজছিলেন নতুন কবিতার পথ। কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছুটা বেরিয়ে এলেও সত্যিকারভাবে নতুন, আধুনিক কবিতার ধারা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁরা মোহিতলাল মজুমদার [১৮৮৮–১৯৫২], যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত [১৮৮৭–১৯৫৪], ও কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯–১৯৭৬]। মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *স্বপন-পসারী* (১৯২২), *বিস্মরণী* (১৯২৭), *স্মর-গরল* (১৯৩৬)। যতীন্দ্রনাথের কাব্য হচ্ছে *মরীচিকা* (১৯২৩), *মরুশিখা* (১৯২৭), *মরুমায়া* (১৯৩০)।

কবি হিশেবে কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত বিখ্যাত। 'বিদ্রোহী কবি' উপাধিটি তাঁর নামের সাথে জড়িয়ে গেছে। তবে তিনি শুধু বিদ্রোহী ছিলেন না। বিদ্রোহের বিপরীত আবেগও রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় তারুণ্যের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে খুব; আর প্রেমের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কৈশোরিক কাতরতা। তাঁর খ্যাতির মূলে সামাজিক-রাজনীতিক কারণ রয়েছে প্রবলভবে। তাঁর কাব্য হচ্ছে *অগ্নিবীণা* (১৯২২), *দোলনচাঁপা* (১৩৩০), *ভাঙ্গার গান* (১৩৩১), *পুবের হাওয়া* (১৩৩২), *বিষের বাঁশী* (১৩৩১), *ছায়ানট* (১৩৩০)। নজরুল একজন মহাপদ্যকার।

জসীমউদ্‌দীনও [১৯০৩–১৯৭৬] ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। পল্লীর জীবন ও কিংবদন্তি অবলম্বন ক'রে কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি 'পল্লীকবি' নামে। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রভাব আছে তাঁর ওপর। তাঁর কাব্য হচ্ছে *রাখালী* (১৯২৭), *নকসী কাঁথার মাঠ* (১৩৩৬), *বালুচর* (১৩৩৭), *সোজনবাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৩)।

বিশশতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি দেখা দেয় আধুনিক কবিতা। এ-কবিতার মধ্যদিয়েই বিশশতক প্রবেশ করে বাঙলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর আধুনিক কবিতায়ই প্রকৃত অভিনব সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যে। মূল্যবানও বটে। এরচেয়ে মূল্যবান আর কিছু সৃষ্টি হয় নি বিশশতকের বাঙলা সাহিত্যে। আধুনিক কবিতা ও এর আগের কবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এ-কবিতায় বদলে যায় বাঙালির চেতনা। দেখা দেয় নতুন জটিল বিস্ময়কর শোভা। বিশশতকের প্রাণ ধরা পড়েছে এ-কবিতায়। এর আগের কবিতা প'ড়ে বুঝতে, অন্তত তার অর্থ বুঝে উঠতে পারে যে-কোনো সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি। কিন্তু এ-কবিতা তাঁদের কাছে মনে হবে দুরূহ-দুর্বোধ্য। এর আগের কবিতা প্রধানত রোম্যান্টিক; কারণ তখন প্রাধান্য বিস্তার ক'রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওই কবিতায় শব্দগুলো কঠিন নয়, ভাবও দুরূহ নয়। অধিকাংশ কবিতায়ই প্রকাশ পেয়েছে এমন বক্তব্য, যার মোটামুটি সারাংশ করা কঠিন নয়। ওই সমস্ত কবিতায় বাঙালির প্রথাগত আবেগ, স্বপ্ন, সুখদুঃখ, কাতরতা ও বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিতা তার পুরোপুরি বিপরীত। এ-কবিতায় বদলে যায় ভাব, বদলে যায় ভাষা। বিশ্বাস, শান্তি, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতির কথা বাঙলা কবিতায় বড়ো বেশি বলা হয়েছে। আধুনিক কবিরা বাদ দেন সে-সব জিনিশ। আগের কবিতার বাঙলা ছিলো পল্লীবাঙলা। আধুনিক কবিরা বেছে নেন নগরকে; রচনা করেন তার সুন্দর-অসুন্দর চিত্র। তাঁরা ক্লান্তির কথা বলেন, অবিশ্বাসের কথা বলেন, নিরাশার কথা বলেন। তাঁরা বলেন ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও নৈঃসঙ্গের কথা, প্রকাশ করেন বিভিন্ন রকমের কামনাবাসনা। এসব কথা বলেন এক ভিন্ন ধরনের বাঙলা ভাষায়। সে-ভাষা জটিল, দুরূহ। ছন্দ বদলে দেন; এবং ছন্দের বদলে কবিতা লেখেন গদ্যে। কবিতায় তাঁরা খচিত করেন মননশীলতা। বাঙলা ভাষার আগের কবিরা আবেগকেই কবিতা ভাবতেন। আধুনিক কবিরা আবেগকে শোধিত করেন মননশীলতা দিয়ে। তাঁরা সবাই অসামান্য শিক্ষিত কবি। নতুন কবিতা সৃষ্টির জন্যে তাঁরা ছুটেছেন বিদেশি কবিতা থেকে কবিতায়। ইংরেজি, ফরাশি, জর্মন কবিতা থেকে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন প্রেরণা; এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে শিখেছেন তাঁরা অনেক কিছু। স্বাভাবিক প্রতিভা ও অধীত জ্ঞানের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের কবিতা।

বাঙলা ভাষায় যাঁরা আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁরাই বাঙলা ভাষার প্রধান কবি। তাঁরা হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮–১৯৭৪], জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯–১৯৫৪], সুধীন্দ্রনাথ দত্ত [১৯০১–১৯৬০], বিষ্ণু দে [১৯০৯–১৯৮২] ও অমিয় চক্রবর্তী [১৯০১–১৯৮৬]। এ-পাঁচজন কবি মিলে সৃষ্টি করেন বাঙলা ভাষায় আধুনিক কবিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রও [১৯০৪–১৯৮৭] সাহায্য করেছিলেন আধুনিক কবিতার বিকাশে; কিন্তু তিনি চেতনার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েন। তাই পুরোপুরি আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কবি হয়ে উঠতে পারেন নি। আধুনিক কবিতার উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো কয়েকটি সাহিত্যপত্রিকা। এর মাঝে দুটি – *কল্লোল* (১৯২৩), ও *কালি-কলম* (১৯২৬), বেরোতো কলকাতা থেকে; এবং একটি – *প্রগতি* (১৯২৭)

—বেরোতো ঢাকা থেকে। আধুনিক কবিতার বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো একটি কবিতাপত্রিকা। নাম *কবিতা* (১৯৩৫)। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন *কবিতার* সম্পাদক। আধুনিক কবিতা কিন্তু শুরুতেই সাদর অভ্যর্থনা পায় নি; বরং বিরূপতার মুখোমুখি হয়েছিলো বেশ। এমনকি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আধুনিকদের বিরোধী। কারণ আধুনিকেরা ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী। আধুনিকেরা এমন কবিতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও আবেগ; ত্যাগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ। নতুনের বিকাশ হয় পুরোনো প্রধানের সাথে সংঘর্ষে। আগের রাজাকে হটাতে না পারলে সিংহাসন অধিকার করা যায় না। আধুনিকেরা বাঙলা কবিতার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে। আধুনিক কবিতার সূচনা-বছর হিশেবে ১৯২৫কে চিহ্নিত করা যায়। বিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে আধুনিক বাঙলা কবিতার সূচনা; আর ত্রিশের দশকে ঘটেছে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা।

বুদ্ধদেব বসুর কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। প্রতিভার বিচিত্রমুখিতায় রবীন্দ্রনাথই তাঁর তুলনা। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, অনুবাদক, সমালোচক, ও সম্পাদক। সব এলাকায়ই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন তিনি, তবে প্রধান পুরোহিত। *কবিতা* সম্পাদনা ক'রে, আধুনিক কবি ও কবিতার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে, বিশ্বের আধুনিক কবিতা অনুবাদ ক'রে তিনি আমাদের আধুনিকতার শিক্ষক হয়ে আছেন। তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে গীতিময় ও আবেগপ্রবণ; এবং তীব্রভাবে সংরক্ত। কামনাবাসনার রঙিন প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩০), *একটি কথা* (১৯৩২), *কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩৭), *দয়মন্তী* (১৯৪৩), *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* (১৯৫৫), *যে-আঁধার আলোর অধিক* (১৯৫৮), *মরচে-পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬), *স্বাগতবিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১)। অনুবাদ করেছিলেন তিনি বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন, রাইনের মারিয়া রিলকে ও আরো কয়েকজন কবির কবিতা। শার্ল *বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা* (১৯৬১), অনুবাদ হিশেবে অসামান্য। এটি পরবর্তী আধুনিক কবিদের প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* (১৯৬৬) অতুলনীয় নাটক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *কালের পুতুল* (১৯৪৬) ও *সাহিত্যচর্চা* (১৩৬১) আধুনিক কবিতার চমৎকার ভাষ্য। বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যকে, বিশেষ ক'রে কবিতাকে, ক'রে তুলেছিলেন নিজের জীবন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার একটি স্তবক :

> দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
> তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
> যেহেতু ফ'লে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
> এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।
> বল তো, বোন, কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল?
> ঢেঁকির গম্ভীর শব্দ দিয়ে তাল জাগবে হাতে-পায় ভঙ্গি?
> ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর?
> শিশিরবিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো?

স্তবক দুটি নেয়া হয়েছে 'গাঁয়ের মেয়েরা' কবিতা থেকে। কবিতাটি আছে *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* নাটকে।

আধুনিকদের মধ্যে এখন জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে জনপ্রিয়; এবং অনেকের মতে–শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; এবং বুদ্ধদেব বসু তাঁকে বলেছিলেন 'নির্জনতম কবি'। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ররূপময়' কথাটি খুব প্রশংসার ছিলো না; কারণ চিত্রের মতো সুন্দর হওয়া রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে খুব ভালো ব্যাপার নয়। তবে আজকাল রবীন্দ্রনাথের কথাটিকে প্রশংসা হিশেবেই ধরা হয়ে থাকে। আসলে জীবনানন্দের কবিতা চিত্রকল্পময়। আধুনিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে সবচেয়ে ব্যর্থ ছিলেন জীবনানন্দ। মৃত্যুও হয়েছিলো তাঁর দুর্ঘটনায়; ট্রামের নিচে প'ড়ে লোকান্তরিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ। হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। করুণ, বিষণ্ন, স্বপ্নময়, আর আশ্চর্য শোভাময় তাঁর কবিতা। ক্লান্তি, বিষাদ, হতাশা প্রভৃতি তাঁর কবিতায় সোনার টুকরোর মতো সুন্দর হয়ে আছে। তাঁর কবিতা অন্তর্গত আলোড়নের কবিতা। বাঙলার অতীত ও বর্তমান প্রাকৃতিক শোভা তাঁর কবিতায়ই অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। কোমলতা তাঁর কবিতার বড়ো বৈশিষ্ট্য; তবে শেষদিকে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিলো কিছুটা কর্কশ। আধুনিক কালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ উপমা রচনা করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। একসময় তাঁকে শুধু কবি, এবং শুধু কবিই ভাবা হতো। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত উপন্যাস পাওয়া গেছে। ওইগুলোও রচনা হিশেবে অসামান্য। ত্রিশের দশকে এগুলো বেরোলে তিনি একজন প্রধান ঔপন্যাসিকের মর্যাদাও পেতেন। কিন্তু যখন বেঁচেছিলেন, তখন বেশি কিছু পান নি জীবনানন্দ। এখন পাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আধুনিকের মর্যাদা। তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *ঝরাপালক* (১৩৩৪), *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৩৪৩), *বনলতা সেন* (১৩৪৯), *মহাপৃথিবী* (১৩৫১), *সাতটি তারার তিমির* (১৩৫৫), *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১)। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের নাম *কবিতার কথা*; উপন্যাসের নাম *মাল্যবান*। জীবনানন্দের রূপভারাতুর একটি কবিতার অংশ :

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাঁহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

কবিতাটির নাম 'অবসরের গান'। কবিতাটি আছে *ধূসর পাণ্ডুলিপিতে*। এটি একটি বিস্ময়কর কবিতা; কবিতাটি পড়ার সময় মনে হয় পৃথিবীতে এক পরম কাব্যিক সময় এসেছিলো, এবং সে-সময়টির খোঁজ পেয়ে জীবননান্দ তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন প্রাণ ভ'রে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কারো কারো মতে, আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবেগ ও মননশীলতার এক অসামান্য মিশ্রণ তাঁর কবিতা। আপাতদৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথ আধুনিকদের

মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ কবি। অভিধান থেকে তিনি প্রচুর অপ্রচলিত শব্দ বেছে নিয়েছেন, এবং সেগুলোতে সঞ্চার করেছেন বিশশতকের উত্তাপ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকাংশ শব্দের অর্থ বুঝে ওঠাই কঠিন তাঁর কবিতার; এবং সেগুলোতে তিনি প্রকাশ করেছেন যে-ভাব, তা বোঝাও সহজ নয়। দর্শন থেকে দর্শনে ফিরেছেন সুধীন্দ্রনাথ। তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন, কিন্তু অবিশ্বাসে তাঁর সমস্ত সত্তা ভ'রে গেছে। কিন্তু আবেগের মুহূর্তে তিনি দুলে উঠতে পারেন তীব্রভাবে। আধুনিক বাঙলা কবিতার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ আবেগউদ্বেল প্রেমের কবিতা তিনিই লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শব্দই কবিতা; আর তিনি অবিশ্বাস করতেন অনুপ্রেরণায়। বাঙলার অধিকাংশ কবি সাধারণত স্বভাবকবি, সুধীন্দ্রনাথ পরিহার করেছিলেন স্বভাবকবিত্ব। তাই তাঁর কবিতা দুরূহ ব'লে মনে হয়। কবিতা ছাড়া তাঁর দুটি প্রবন্ধের বইও রয়েছে। তাঁর গদ্যও বাঙলা ভাষায় দুরূহতম। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *তন্বী* (১৩৩৭), *অর্কেস্ট্রা* (১৯৩৫), *ক্রন্দসী* (১৩৪৪), *উত্তরফাল্গুনী* (১৩৪৭), *সংবর্ত* (১৩৬০)। তাঁর অনূদিত কবিতাগ্রন্থের নাম *প্রতিধ্বনি* (১৩৬১)। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে *স্বগত* (১৩৪৫), ও *কুলায় ও কালপুরুষ* (১৩৬৪)। তাঁর সমগ্র কবিতা এখন একসাথে পাওয়া যায় *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ* -এ (১৯৬২); এবং সমস্ত প্রবন্ধ একসাথে পাওয়া যায় *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ* -এ (১৩৯০)। তাঁর একটি আবেগস্পন্দিত কবিতার অংশ :

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শতজনমের আগে —
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।

কবিতাটির নাম 'শাশ্বতী', রয়েছে *অর্কেস্ট্রা* কাব্যগ্রন্থে।

অমিয় চক্রবর্তীকে আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, স্নিগ্ধ, ধ্যানী ব'লে মনে হয়। বিশ্বাসী ব'লেও মনে হয়। সরল ব'লেও মনে হয়। কিন্তু তাঁর কবিতায়ও রয়েছে গভীর অবিশ্বাস, জটিলতা। মানসভ্রমণ চলেছে তাঁর দেশেদেশে, ঘুরেছেন তিনি দর্শন থেকে দর্শনে। তাঁর কবিতার স্বাদ পাওয়ার জন্যে বাইরের তীব্র জগৎকে ভুলে ঢুকতে হয় ভেতরে,

নমিতভাবে। কবিতার সাথে কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *খসড়া* (১৩৪৫), *একমুঠো* (১৩৪৬), *মাটির দেয়াল* (১৩৪৯), *অভিজ্ঞানবসন্ত* (১৩৫০), *দূরযানী* (১৩৫১), *পারাপার* (১৩৬০), *ঘরে ফেরার দিন, হারানো অর্কিড*। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে *সাম্প্রতিক*। যে-কবিতাটির জন্যে তিনি বিশ্বাসী ব'লে বিখ্যাত, তার অংশ :

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা,
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা, —
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে। তাঁর কবিতা কখনো আবেগঘন, কখনো তীব্র; কখনো মননশীলতায় গম্ভীর, ও দুরূহ-জটিল। কবিতার পংক্তি থেকে পংক্তিতে, স্তবক থেকে স্তবকে এগোনোর সময় তিনি অনেক সময় যুক্তিকে করেছেন অস্বীকার, এবং রচনা করেছেন পাঠকের জন্যে বিহ্বলকর কবিতা। তবে যে-তিনজন কবি আধুনিক কালের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন, বিষ্ণু দে তাঁদের একজন। অন্য দুজন হচ্ছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ। আধুনিকদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই একটি স্পষ্ট রাজনীতিক দর্শন ছিলো, তা হচ্ছে সাম্যবাদ। রাজনীতিক আদর্শে বিশ্বাসী কবিরা সাধারণত হয়ে থাকেন সরল, উচ্চকণ্ঠ, আবেগপ্রবণ ও বাগ্মী; কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর বিপরীত। প্রচুর কবিতা লিখেছেন তিনি, প্রবন্ধও লিখেছেন বেশকিছু। তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *উর্বশী ও আর্টেমিস* (১৯৩২), *চোরাবালি* (১৯৩৮), *পূর্বলেখ* (১৯৪১), *সন্দ্বীপের চর* (১৯৪৭), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৪১–৪৪), *অন্বিষ্ট* (১৯৫০), *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার* (১৯৫০), *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮), *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ* (১৯৬৩), *সেই অন্ধকার চাই* (১৩৭৩), *ইতিহাসে ট্র্যাজিক উল্লাসে* (১৩৭৭), *উত্তরে থাকো মৌন* (১৯৭৭), *আমার হৃদয়ে বাঁচো* (১৯৮২)। তার প্রবন্ধের বই হচ্ছে *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ* (১৯৫২), *এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য* (১৯৬৮), *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যের আধুনিকতার সমস্যা* (১৯৬৬)। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম *এলিঅটের কবিতা* (১৯৫০)। তাঁর কবিতার কয়েকটি স্তবক :

সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
মুখর সে-গান ভেঙে গেলো। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল?
এই তবে ভোরবেলা

হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

এ-স্তবকগুচ্ছ নেয়া হয়েছে *চোরাবালি* কাব্যের 'ক্রেসিডা' নামক কবিতা থেকে। এটি এক অতুলনীয় জটিল-সুন্দর কবিতা।

আধুনিক কবিতার সূচনার পর কেটে গেছে ছ-দশক। প্রথম মহান আধুনিকদের পর দেখা দিয়েছেন দশকে দশকে নতুন নতুন আধুনিকেরা; এবং বাঙলা আধুনিক কবিতাকে ক'রে তুলেছেন গভীর, ব্যাপক, বিচিত্র। প্রথম আধুনিকদের পরেই যিনি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কবি, তাঁর নাম সমর সেন [১৯১৬–১৯৮৭]। তিনি লিখেছেন কম, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লিখেছেন তিনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *কয়েকটি কবিতা* (১৯৩৭), *গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৪০), *তিনপুরুষ* (১৯৪৪)। *সমর সেনের কবিতা* নামক একটি সংগ্রহে তাঁর প্রায় সব কবিতা পাওয়া যায়। আরেকজন কবির নাম বলা দরকার, তবে তিনি ঠিক আধুনিক নন। তাঁর নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য [১৯২৬–১৯৪৭]। মাত্র একুশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন সুকান্ত। বাঙলার অকালমৃত কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রতিভাবান। বাঙলা ভাষায় মার্কসীয় ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সুকান্ত। তাঁর কাব্যগ্রন্থ *ছাড়পত্র* (১৩৫৫), *পূর্বাভাস* (১৩৫৫), *ঘুম নেই* (১৩৫৫)। আধুনিক কবিতার এখন শেষ পর্যায় চলছে। এখন অনেক কবিই আবার হয়ে উঠছেন অনাধুনিক।

বিশশতকের কথাসাহিত্য–গল্প ও উপন্যাস–যে নতুন হবে, বিশশতকের বাস্তব ও স্বপ্নকে প্রকাশ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ-শতকে ঔপন্যাসিকেরা, গল্পকারেরা নতুন নতুন প্রশ্ন তুলেছেন, জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন নতুন চোখে। উপন্যাস তাই চ'লে গেছে রূঢ় অশ্লীল বাস্তবে; আবার প্রবেশ করেছে অবচেতনে। ধরা পড়েছে বিচিত্র কামনা বাসনা; এবং অনেক নিষিদ্ধ কথা প্রকাশ করেছে অবলীলায়। বাঙলা উপন্যাসে ছ-জন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে রয়েছেন দু-জন চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্র [১৮৩৮–১৮৯৪], শরৎচন্দ্র [১৮৭৬–১৯৩৮]), তিনজন বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাশঙ্কর [১৮৯৮–১৯৭১], বিভূতিভূষণ [১৮৯৪–১৯৫০], মানিক [১৯০৮–১৯৫৬] ও একজন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১–১৯৪১])। তাঁদের পাঁচজনই বিশশতকের। তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার। তাঁরা সবাই মিলে বিশশতকের কথাসাহিত্যকে জীবনের মতো ব্যাপক ক'রে তুলেছেন। ওপরের কয়েকজন ছাড়া উল্লেখযোগ্য যাঁদের নাম, তাঁরা হচ্ছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [১৮৭৩–১৯৩২], নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত [১৮৮২–১৯৬৪], জগদীশচন্দ্র গুপ্ত [১৮৮৬–১৯৫৭], প্রেমেন্দ্র মিত্র [১৯০৪–১৯৮৭], বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮–১৯৭৪], অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [১৯০৩–১৯০৬], ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় [১৮৯৪–১৯৬১], বনফুল [১৮৯৯–১৯৭৯], সতীনাথ ভাদুড়ী [১৯০৬–১৯৬৫], সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ [১৯২২–১৯৭১]।

আমাদের শ্রেষ্ঠতম কবি রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকও। ছোটগল্পে তো তিনি শ্রেষ্ঠতম। জীবনসম্ভারে ও শিল্পনিপুণতায় তাঁর ছোটগল্পের কোনো তুলনা নেই বাঙলায়। উপন্যাসেও তাঁর অসামান্যতা বিস্ময়কর। তিনি আমাদের জীবন ও চেতনার একটি বড়ো অংশ গভীরভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের ভাষাও অনবদ্য। তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নন, পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্যে তিনি উপন্যাস রচনা করেন নি। তিনি দিয়েছেন জীবন ও চেতনার ভাষ্য। উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন তিনি অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের ধরনে। তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস *বৌঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩), *রাজর্ষি*তে (১৮৮৭)। *নৌকাডুবি* (১৯০৬) নামে তাঁর একটি উপন্যাস রয়েছে, তাতেও ঠিক রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বলতে যাঁকে বুঝি, তাঁর সূচনা হয় *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসে। এ-উপন্যাসটিতেই সূচিত হয় বাঙলা উপন্যাসের আধুনিক যুগ। কয়েকটি নতুন জিনিশ দেখা দেয় এ-উপন্যাসে। বাস্তবের চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে গ্রহণ করেন আধুনিক ভঙ্গি। বিশ্লেষণ করেন পাত্রপাত্রীদের মনস্তত্ত্ব। পরিত্যাগ করেন প্রথাগত নীতিবোধ। এসব কারণে *চোখের বালি*কে বিশশতকি বাঙলা উপন্যাসের সূচনাগ্রন্থ হিশেবে গণ্য করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সেগুলো হচ্ছে *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬), *যোগাযোগ* (১৯২৯), *শেষের কবিতা* (১৯২৯), *দুইবোন* (১৯৩৩), *মালঞ্চ* (১৯৩৪), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪)। বাঙলার জীবন, রাজনীতি, ব্যক্তিমানুষের কামনাবাসনার অসামান্য চিত্রণ যেমন পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে, তেমনি পাওয়া যায় বাঙলা গদ্যের অপূর্ব বিকাশ। আর কারো উপন্যাসে ভাষা এমন উজ্জ্বলতা লাভ করে নি।

রবীন্দ্রনাথের পর সাড়া জাগিয়ে দেখা দেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন, জনপ্রিয়তায় তাঁকে আর কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ঔপন্যাসিক হিসেবে কয়েক দশক আগে তিনি যে-মর্যাদা পেতেন, এখন আর তাঁকে তা দেয়া হয় না; তবে তিনি আবার মর্যাদা পাবেন। তিনি শস্তা জনপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাঙলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকদের একজন। তিনি বাঙালির আবেগস্রোতকে খুলে দিয়েছিলেন; এবং আবেগে ভেসে গিয়েছিলো পাঠকেরা। তিনি সবকিছু দেখতেন হৃদয়ের যুক্তির সাহায্যে, মস্তিষ্কের সাহায্যে নয়। তিনি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কিছু ব্যাপারকে নিয়ে এসেছিলেন সামনে, সেগুলোকে দিয়েছিলেন মহিমা। দাঁড়িয়েছিলেন সামাজিক অনেক রীতিনীতির বিরুদ্ধে। তাই তিনি ছিলেন একধরনের বিদ্রোহী। বাঙালির আবেগ ও ভাবাবেগের মুক্তিদাতা হিশেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন শরৎচন্দ্র। বহু উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, যেগুলো একসময় বাঙালির প্রাত্যহিক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলো হচ্ছে *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত* (চারপর্ব, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩), *দত্তা* (১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী* (১৯২৬)। এছাড়া আছে *পরিণীতা (১৯১৪)*, *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *চন্দ্রনাথ* (১৯১৬), *দেনা-পাওনা* (১৯২৩), *বিপ্রদাস* (১৯৩৫), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১)। শরৎচন্দ্রের থেকে বয়সে কম হ'লেও তাঁর এক দশক আগে থেকেই উপন্যাস-গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ *ষোড়শী* (১৯০৬), *রমাসুন্দরী*

(১৯০৮), *নবীন সন্ন্যাসী* (১৯১২), *গল্পাঞ্জলি* (১৯১৩), *রত্নদ্বীপ* (১৯১৫), *সিঁদুর-কৌটা* (১৯১৯) প্রভৃতি।

সাহিত্যে রক্ষণশীল আর প্রগতিশীলদের মধ্যে মাঝেমাঝেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রক্ষণশীলেরা সাধারণত হয়ে থাকে প্রতিভাহীন, ও একগুঁয়ে, এবং বেশ ভণ্ড। প্রগতিশীলেরা হয় সত্যসন্ধানী, প্রতিভাবান। তরুণ প্রগতিশীল প্রতিভা আক্রান্ত হয় বৃদ্ধ রক্ষণশীলদের দ্বারা। বাঙলা সাহিত্যে এটা ঘটেছে মাঝেমাঝেই। এ-শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি দেখা দেয় প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার বিবাদ। উপন্যাসের বিষয় সার্বিক জীবন। তার ভালো ও মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দর, শ্লীল ও অশ্লীল, সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ সবকিছুই উপন্যাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। উনিশশতকের ঔপন্যাসিকেরা সবকিছুকে স্থান দিতেন না উপন্যাসে। জীবনের ভালো দিকটাকেই তাঁরা তুলে ধরতেন। তাঁদের উপন্যাসে কোনো চরিত্র যদি সমাজঅসম্মত কাজ করতো, তাহলে তাদের দেয়া হতো মৃত্যুর মতো শাস্তি। এর বিখ্যাত উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর বিধবা রূপসী রোহিণী। রোহিণী বাল্যবিধবা। তাঁর স্বপ্নের জীবন শুরু হওয়ার আগেই সে বিধবা হয়ে গেছে। জীবনে তার কোনো অধিকার নেই। সমাজ তার সমস্ত স্বপ্ন ও বাসনাকে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সে জীবন উপভোগে ব্যগ্র। তাই বঙ্কিম তাকে শাস্তি দেন; বন্দুকের গুলিতে মরতে হয় রোহিণীকে। রোহিণীকে মেরে শান্তি পান বঙ্কিম ও স্থির থাকে হিন্দু সমাজ। কিন্তু আধুনিকেরা এটা মেনে নিতে পারেন নি। যেমন রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালির* বিনোদিনীও বিধবা, ও জীবনের জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনো শাস্তি দেন নি; বরং তাঁর কামনাকে চিত্রিত করেছেন সহানুভূতির সাথে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তো দেখি নিষিদ্ধ কামনার জয়জয়কার। এতে বিচলিত হয়েছিলেন রক্ষণশীলেরা। যতীন্দ্রমোহন সিংহ নামে একজন রক্ষণশীল লেখক *সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা* (১৯২২) নামে একটি বই লেখেন। আরো কেউ কেউ আধুনিক সাহিত্যকে বেশ অশালীন ভাষায় তিরস্কার করেন।

এ-শতকের তৃতীয় দশকে সাহিত্যে 'বাস্তবতা'র স্থান আর সীমা নিয়ে কলহ ঘন হয়ে দেখা দেয়। তাতে জড়িয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথও। এ-সময়ে তরুণ লেখকেরা চাইছিলেন নতুন সাহিত্য, নতুন বাস্তবতা, যা নেই আগের উপন্যাসে। ওই বাস্তবতা বেশ নির্মম, বেশ অশালীন, ও শিউরে ওঠার মতো। উনিশশতকের শেষদিকে এমন বাস্তবের ছবি এঁকেছিলেন ইউরোপের অনেক ঔপন্যাসিক; এবং বিশশতকেও তাঁরা জীবনের তলদেশ খুঁড়েখুঁড়ে উদ্‌ঘাটন করছিলেন অনেক নির্মম, পীড়াদায়ক ব্যাপার। তৃতীয় দশকের বাঙালি লেখকেরাও তাই করতে চাইলেন। তাঁরা সুন্দর জীবন থেকে চ'লে যেতে চাইলেন বস্তিতে, তাঁরা উঁচু জীবন থেকে ঢুকতে চাইলেন নিচু জীবনে। জীবনের পাতালে, যেখানে জ'মে আছে জীবনের সমস্ত নোংরা। রবীন্দ্রনাথও শিউরে উঠলেন এতে। এর ফলে শুরু হলো বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ লেখকদের কলহ। রবীন্দ্রনাথেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো। এতে উপকৃত হয় বাঙলা উপন্যাস। নতুন ধারার ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে বাঙলা সাহিত্য।

যেমন আধুনিক কবিতা সৃষ্টিতে, তেমনি আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টিতে তীব্র ভূমিকা নিয়েছিলো কয়েকটি পত্রিকা। প্রথম নাম করতে হয় *কল্লোল*-এর (১৯২৩)। এ-পত্রিকাটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জননীর মতো। এর নাম অনুসারে একটি যুগকে এখন 'কল্লোল

যুগ'ই বলা হয়। আধুনিকতার পক্ষে ছিলো আরো দুটি পত্রিকা : ঢাকার *প্রগতি* (১৯২৭), আর কলকাতার *কালি-কলম* (১৯২৬)। এ-পত্রিকাগুলো, বিশেষ ক'রে *কল্লোল* ছিলো বিদ্রোহী। তরুণ লেখকেরা এসব পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলেন নতুন অভিজ্ঞতা। ওই অভিজ্ঞতা পুরোনোদের কাছে মর্মান্তিক। বস্তির সত্য তাঁরা প্রকাশ করতে শুরু করলেন, যখন পুরোনোরা ব্যস্ত গৃহের সাজানো সত্য নিয়ে। লেখকদের অভিজ্ঞতা এ-সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পশ্চিম থেকে। পশ্চিমে ফ্রয়েড-এর তত্ত্ব মানুষকে দেখছে নতুনভাবে। জোলা, গোর্কি, হামসুন, বোয়ার, আরো অনেক ঔপন্যাসিক উদ্‌ঘাটন করেছেন জীবনের অবস্তর। সে-স্তর সুন্দর নয়, শোভন নয়, স্বস্তিকর নয়। আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিকেরাও সাধনা শুরু করলেন অবস্তর উপস্থাপনের। বদলে গেলো উপন্যাস।

নতুনদের পুরোধা হয়ে দেখা দেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন এক সাড়াজাগানো মানুষ। যে-দিকেই গেছেন, সে-দিকেই ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ছিলেন, ডক্টরেট উপাধি ছিলো; কিন্তু প্রথাগত ছিলেন না তিনি। ছিলেন প্রথাবিরোধী। আজকাল তিনি অনেকটা বিস্মৃত। তিনি কামনা ও অপরাধকে তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয় ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *শুভা* (১৯২০), *অগ্নিসংস্কার* (১৯২০), *শান্তি* (১৯২১), *সর্বহারা* (১৯২৯), *অভয়ের বিয়ে* (১৯৩১), *বিপর্যয়*। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় [১৯০০–১৯৭৬] সাড়া জাগিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসে, বিশেষ ক'রে গল্পে, অবস্তরের জীবনের ছবি এঁকে। কয়লাকুঠির জীবনের নির্মম চিত্র পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। লেখক হিশেবে তিনি অত্যন্ত গৌণ; তবে বাঙলা গল্পের বাস্তবতার সীমাকে তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব'লে স্মরণীয়। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *ঝড়ো হাওয়া* (১৩৩০), *ষোল-আনা* (১৩৩২), *মহাযুদ্ধের ইতিহাস* (১৩৩৩), *পূর্ণচ্ছেদ* (১৩৩৬)। বাস্তবের নির্মম-নির্মোহ চিত্রণের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর উপন্যাসে মানুষ ইতরপ্রাণীমাত্র। তাঁর উপন্যাস *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯), *লঘুগুরু* (১৯৩১), *গতিহারা জাহ্নবী* (১৯৩৫), *দুলালের দোলা* (১৯৩১)।

বিশশতকের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেনো পল্লীবাঙলার গদ্য-মহাকাব্যরচয়িতা। *পথের পাঁচালী* তাঁকে অমরত্ব এনে দিয়েছে। মানুষ ও নিসর্গ তাঁর উপন্যাসে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে আছে। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *পথের পাঁচালী* (১৯২৯), *অপরাজিত* (১৯৩২), *আরণ্যক* (১৩৪৫), *বিপিনের সংসার* (১৩৪৮), *আদর্শ হিন্দু হোটেল* (১৩৪৭), *দেবযান* (১৩৫১)। অনেকের মতে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের সাধারণ জীবন ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারেরা স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসেও চোখে পড়ে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *গণদেবতা* (১৯৪২), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩), *হাসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭), *কবি (১৯৪৭)*, *নাগিনীকন্যার কাহিনী* (১৯৫১)। আমাদের অতি-প্রশংসিত ঔপন্যাসিকদের একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন রকম তত্ত্ব অবলম্বন করেছেন তিনি উপন্যাসে। তাই তাঁর উপন্যাস অন্যান্যের থেকে কিছুটা জটিলও। মনের গোপন কামনাবাসনা থেকে শ্রেণীসংগ্রাম রূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *শহরতলী* (১৯৪০), *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮)।

আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দু-জন কবি। একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্যজন বুদ্ধদেব বসু। প্রেমেন্দ্র মিত্র বস্তির জীবনের কাহিনী লিখে সাড়া জাগিয়েছিলেন। *পাঁক* (১৯২৬) তাঁর সাড়াজাগানো উপন্যাস। তাঁর আরো উপন্যাস হচ্ছে *মিছিল* (১৯৩৩), *উপনয়ন* (১৯৩৩), *আগামীকাল* (১৩৪১), *কুয়াশা* (১৯৪৬)। কবি ও ঔপন্যাসিক হিশেবে অনেক বড়ো বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্রের থেকে। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে বাহ্যিক ঘটনার থেকে বেশি জোর দিয়েছেন মনোঘটনার ওপর। তিনি অন্তর্জগতের ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *সাড়া* (১৯৩০), *যেদিন ফুটল কমল* (১৯৩৩), *ধূসর গোধূলি* (১৯৩৩), *তিথিডোর* (১৯৪৯), *মৌলিনাথ* (১৯৫২), *রাতভর বৃষ্টি* (১৯৬১)। বনফুল ছিলেন শ্লেষপ্রবণ। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *মৃগয়া* (১৯৪০), *জঙ্গম* (১৩৫০), *স্থাবর* (১৩৫৮)। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস আন্তর চেতনার। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫), *আবর্ত* (১৯৩৭), *মোহানা* (১৯৩৭)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রচুর লিখেছেন। যতোটা সাড়া জাগিয়েছিলেন তিনি, ততোটা গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস অবশ্য তিনি লিখতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে *বিবাহের চেয়ে বড়ো* (১৯৩১), *বেদে* (১৩৩৫), *আকস্মিক* (১৯৩০), *নবনীতা* (১৩৪৩), *প্রথম কদম ফুল* (১৯৬৩)।

এ-শতকে ফলেছে ছোটগল্পের অসাধারণ শস্য। বাঙলা ভাষায় ছোটগল্পের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই ঘটিয়েছিলেন এর বিকাশ। মানুষের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে একরাশ অসামান্য গল্প রচনা করেন তিনি। তাঁর গল্পে ঘটে জীবন ও শিল্পের বিস্ময়কর সমন্বয়। উনিশশতকের শেষ দশকে প্রায় ভ'রে গল্প লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাতে ভ'রে ওঠে পাঠকদের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের গল্প সংগৃহীত হয়েছে *গল্পগুচ্ছ*-এর (১৯২৬) তিনটি খণ্ডে। বিশশতকের প্রধান ঔপন্যাসিকেরাও জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে লিখেছেন গল্প। এসব গল্পে টুকরোটুকরো হয়ে ধরা পড়েছে আমাদের জীবন। সম্ভবত বাঙলা উপন্যাসের চেয়ে বাঙলা ছোটগল্প অনেক বেশি শিল্পসফল। বাঙলি প্রতিভা উপন্যাসের বিশালতায় যতোটা বিচ্ছুরিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছুরিত হয়েছে ছোটগল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন ছোটগল্প নিয়ে। তাঁর প্রথম গল্প 'মন্দির' সেকালের একটি গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলো। পুরস্কারটির নাম 'কুন্তলীন-পুরস্কার'। 'মন্দির' বেরিয়েছিলো ১৯০৩-এ। তারপর বহু গল্প লিখেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্প ছোটগল্পের সংজ্ঞাটিকে ঠিক মেনে চলে নি; তবে আলোড়িত করার মতো উপাখ্যান উপহার দিয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রচুর গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *ষোড়শী* (১৯০৬), *গল্পাঞ্জলি* (১৯১৩), *গল্পবীথি* (১৯১৬), *জামাতা বাবাজী* (১৯৩১)। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন প্রচুর গল্প। তাঁর প্রথম গল্পের নাম *ঠানদিদি* (১৯১৮)। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর ছোটগল্প। ১৩২৯-এ 'রেজিং রিপোর্ট' নামে তাঁর একটি গল্প বেরোয়; এবং তীব্র সাড়া জাগায়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন কিছু অসামান্য অবিনাশী গল্প। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *জলসাঘর* (১৯৩৭), *রসকলি* (১৯৩৮), *বেদেনী* (১৯৪০), *নারী ও নাগিনী*, *ইমারত*। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

অতসী মামী (১৯৩৫), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬), *ছোটবকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ *মেঘমল্লার* (১৩৩৮), *মৌরীফুল* (১৩৩৯), *কিন্নর দল* (১৩৪৫)। বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থ হচ্ছে *অভিনয় অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প* (১৯৩০), *এরা ওরা এবং আরো অনেকে* (১৯৩২), *ঘরেতে ভ্রমর এলো* (১৯৩৫)। তাঁর গল্পের একটি চমৎকার সংকলনের নাম *ভাসো আমার ভেলা*। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থ *পঞ্চশর* (১৩৩৬), *বেনামী বন্দর* (১৩৩৭), *মৃত্তিকা* (১৯৩২)।

বিশশতকের দুজন অতুলনীয় গদ্যশিল্পীর কথা মনে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১–১৯৫১] ও প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮–১৯৪৬]। দুজনই রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়; এবং বিশশতকের দুই প্রধান বাঙালি, ও প্রতিভা। তাঁরা কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি ক'রে প্রধান হন নি। তাঁরা গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা অমর হয়ে আছেন তাঁদের অনন্য গদ্যশিল্পের জন্যে। অবনীন্দ্রনাথ মানে গদ্য, প্রমথ চৌধুরী মানে গদ্য। বিস্ময়কর গদ্য। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের একজন প্রধান চিত্রকর। ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্যে; এবং সাহিত্যে এঁকে গেছেন চিত্রের পর চিত্র। তাঁর গল্প, বক্তব্য ইত্যাদির প্রাণ যেনো তাঁর ভাষা। ১৮৯৫-এ বেরোয় অবনীন্দ্রনাথের *ক্ষীরের পুতুল* ও *শকুন্তলা*। রূপকথার রূপে ভ'রে আছে বই দুটি। তাঁর অন্যান্য বই *বাংলার ব্রত* (১৯০৯), *রাজকাহিনী* (১৯০৯), *ভূতপেত্নীর দেশ* (১৩২২), *খাতাঞ্চির খাতা* (১৩২৩), *আলোর ফুলকি* (১৯৪৭), *বুড়ো আংলা* (১৩৪১), *বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী* (১৯৪১), *ঘরোয়া* (১৩৪৮), *জোড়াসাঁকোর ধারে* (১৩৫১), *আপন কথা* (১৩৫৩)। বিস্ময়কর এসব বই। কৈশোরেই এগুলোর অধিকাংশ প'ড়ে ফেললে জীবন সোনায় ভ'রে উঠতে পারে। প্রমথ চৌধুরী বিখ্যাত হয়ে আছেন চলতি রীতির প্রধান প্রবক্তা হিশেবে। তার ছদ্মনাম ছিলো বীরবল। *সবুজপত্র* নামে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন তিনি ১৯১৪ অব্দে। এটিতে তিনি চলতি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিশেবে ব্যবহারের আন্দোলন শুরু করেন। সফল হন। তবে শুধু চলতিরীতির প্রবক্তা হিশেবে নয়, অনন্য গদ্যরীতির জন্যে অবিস্মরণীয় প্রমথ চৌধুরী। তিনি গল্প লিখেছেন, কবিতাও লিখেছেন; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদান তাঁর প্রবন্ধাবলি। *সনেট-পঞ্চাশৎ* (১৯১৩), ও *পদ-চারণ* (১৯১৯) তাঁর কাব্যগ্রন্থ। *চার ইয়ারী কথা* (১৯১৬) তাঁর গল্পগ্রন্থ। *প্রবন্ধসংগ্রহ* নামে দু-খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ। অনন্য তাঁর গদ্য।

নাটকে বাঙলা সাহিত্য গরিব। উনিশশতকের দ্বিতীয় অংশে বেশ কয়েকজন বেশ বড়ো নাট্যকার দেখা দিয়েছিলেন। বিশশতকে কি তেমন দেখা দিয়েছে? মনে হয় দেয় নি। মধুসূদন অলীক কুনাট্যের কথা বলেছিলেন। রাঢ়ের বঙ্গে এখনো লোকজন তাতে মজে। বাঙলার জীবনে বোধহয় নাট্যগুণ নেই, নাটকীয়তা থাকলেও। নাটক রচিত হয় মঞ্চস্থ হওয়ার জন্যে। মঞ্চে সফল হওয়া নাটকের একটা বড়ো গুণ। তবে মঞ্চে সফল হ'লেই নাটক উৎকৃষ্ট হয় না। বরং মঞ্চে সফল হ'তে গিয়েই ব্যর্থ হয় বাঙলার অধিকাংশ নাটক। বাঙলা ভাষায় লেখা অধিকাংশ মঞ্চসফল নাটক সাহিত্য হিশেবে নিকৃষ্ট। বিশশতকে নাটকের ক্ষেত্রে খুব বড়ো প্রতিভা বেশি চোখে পড়ে না। বিশশতকে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর নাটক অবশ্য জীবনচিত্রণ নয়, ভাবচিত্রণ। কিন্তু তাঁর নাটক সাহিত্যসৃষ্টি হিশেবে অসামান্য ব'লে উৎকৃষ্ট নাটক হিশেবে গণ্য। বেশ পরে বুদ্ধদেব বসু এমন উন্নত

সাহিত্যিক নাটক লিখেছেন। এ ছাড়া সাহিত্যিক গুণে আর কারো নাটক বিশেষ সমৃদ্ধ নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রচুর নাটক, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য লিখেছেন। এগুলোর সবই কবির হাতের লেখা। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাংকেতিক-রূপক নাটকে তিনি অনন্য। তাঁর নাট্যসাহিত্যে রয়েছে *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১২৮৭), *কালমৃগয়া* (১২৮৯), *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১২৯১), *মায়ার খেলা* (১২৯৫), *বিসর্জন* (১২৯৬), *মালিনী* (১৩০৩), *রাজা* (১৩১৭), *অচলায়তন* (১৩১৮), *ডাকঘর* (১৩১৮), *মুক্তধারা* (১৩২৯), *রক্তকরবী* (১৩৩১), *চিরকুমার সভা* (১৩৩২), *বসন্ত* (১৩৩৩), *নটীর পূজা* (১৩৩৩), *কালের যাত্রা* (১৩৩৯), *তাসের দেশ* (১৩৪০), *চণ্ডালিকা* (১৩৪০), *বাঁশরী* (১৩৪০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৩৪২)। বিশশতকে আরো অনেকে নাটক লিখেছেন; কিন্তু তাঁদের বড়ো নাট্যকার বলা যায় না। তবে দু-একজনের দু-একটি নাটক উল্লেখযোগ্য। যেমন, মন্মথ রায়ের *কারাগার*, বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* (১৯৪৪)। ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু লেখেন কয়েকটি অতুলনীয় কাব্যনাটক। তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*, *কলকাতার ইলেকট্রা* কাব্যগুণে অসামান্য।

বিশশতক কেটে যাওয়ার আর বাকি নেই। বিশশতকের সাহিত্যের কথা বললাম খুব সংক্ষেপে। বলেছি শুধু বিশশতকের প্রথম অর্ধেকের কথা। দ্বিতীয় ভাগের কথা কিছুই বলিনি। এ-সময়েও জন্ম নিয়েছেন অনেক বড়ো কবি ও ঔপন্যাসিক। তবে এ-শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি যে-আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিলো, তাই এ-শতকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভাগে অতো বড়ো কেউ জন্মান নি। তাঁদের প্রতিভা ছিলো; কালের আনুকূল্যও পেয়েছিলেন তাঁরা। তাই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এমন সাহিত্য, যা ধারণ করেছে আধুনিক কালের চেতনা। ওই চেতনা ভিন্ন উনিশশতকের চেতনার থেকে। আগামী শতকে দেখা দেবে নতুন চেতনা। হয়তো তার আভাস দেখা দেবে বিশশতকের শেষ দশকেই। তা হয়তো বহুবর্ণের দীপাবলি হয়ে দেখা দেবে একুশশতকের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে। চিরকাল জ্বলবে বাঙলা সাহিত্যের লাল নীল দীপাবলি।
